Any writing always presupposes an approach, and thus engenders voices of assent as well as contention. The reader becomes a participant refuting, endorsing or even replenishing the writing with his/her quest for the unmentioned, embedded possibilities in the text. The third version of Bodhikala is a collection of critical essays exploring various potent topics- each unique in its flavor and significance, promising 'unenforced reading'. The 'text' has grown in magnitude encompassing areas beyond the printed book with line, and any critical orating on the 'text' speaks more than the original has ever communicated. The essays in this journal provide the reader with the scope of restructuring or remodeling his/her views ideas, scale of values and understanding of life and society.

We are extremely privileged to have the distinction of carrying the contributions of distinguished writes from various fields, academies and beyond, in other words, a panoply of wisdom in all its variegated colours. We hope to meet the expectations of our erudite readers this year too.

বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনা নিয়ে কিছু প্রশ্ন

দেবেশ রায়*

বাংলা গদ্যের ইতিহাস পড়া ও বোঝার যুক্তি নিয়ে কিছু প্রশ্ন তৈরি করে তুলতে চাই।

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র বলে, প্রশ্ন তৈরি করে তোলাই প্রধানতর কাজ, উত্তর খোঁজা বা পাওয়া ততটা নয়। কোনো প্রশ্ন তৈরিই হতে পারে না, আগের কিছু উত্তরের ভিত্তি ছাড়া।

পরন্তু, ন্যায়শাস্ত্র, জ্ঞানের প্রমাণেরই অনুশীলন করে। ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণের পরিচয় নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। সেই মতভেদের ভিত্তিতেই ন্যায়শাস্ত্রের বিভিন্ন টীকা বা স্কুল বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রমাণ-অপ্রমাণ নিয়ে কার্টেজীয় যুক্তিবিজ্ঞানও যথেষ্ট সক্রিয় কিন্তু সে-সক্রিয়তা ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ-অপ্রমাণ অনুশীলনের তুলনায় প্রায় কিছুই নয়। এ-কথাটি মনে রাখা আমাদের আধুনিক জ্ঞানচর্চায় দরকার যে ন্যায়শাস্ত্রের বিভিন্ন টীকা বা ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠান এখনো কিন্তু প্রাসঙ্গিক। অনেকটা সক্রিয়ও বটে। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের (এপিস্টেমোলজি) অনেক আধুনিক সমস্যার সমাধানের ইশারা হয়তো ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে কোথাও-কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়। তেমন খুঁজেছেন, তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, বা এখনো খুঁজছেন, জিতেন মহান্তি।

আপাত বিচারে, ইতিহাস-রচনা নৈয়ায়িক কোনো প্রমাণের বিষয় হতে পারে না। ইতিহাসের ধারণার মধ্যেই অনেক স্ববিরোধিতা আছে। যে-স্ববিরোধিতাকে ইতিহাসের ধারণার দ্বন্দ্ব বা ডায়ালেকটিকও বলা যেতে পারে। ইতিহাস বলতে একটা নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। পরস্পর বিপরীতও বোঝায়। একদিকে ইতিহাস কালানুক্রমিক বিবরণ। আর একদিকে ইতিহাস অপরিবর্তনীয় একটি অবস্থানের ব্যাখ্যান। প্রথম ধারণাটি গতিশীল। দ্বিতীয় ধারণাটি অনড় ও স্থিতিশীল। সম্রাট অশোকের তৈরি বৌদ্ধ স্তূপগুলি কোথায়-কোথায় কী উপলক্ষে স্থাপিত হয়েছিল সেটা একটা ইতিহাস। আবার, তেমন একটি মাত্র স্তূপের গঠনবৈচিত্র্যের বিবরণও ইতিহাস। অজন্তা গুহায় কেন, কবে ঐ চিত্রমালা আঁকা হয়েছে সেই কালনির্ভর বিবরণ যেমন ইতিহাস, তেমনি একটি কোনো চিত্রের অঙ্কন-বৈশিষ্ট্য, বর্ণলেপনের ধরন ও রেখা ব্যবহারের বিবরণও ইতিহাস। অনেক সময়ই এই দ্বিতীয় ধরনের ইতিহাস, ঘটনা ঘটার সময়ের চাইতে ইতিহাস-রচনার কালের সঙ্গে অনেক নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে, বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে।

ন্যায়শাস্ত্র সত্য বা জ্ঞান প্রমাণের জন্য যে-পদ্ধতি ও প্রকরণ স্থির করে দিয়ে আসছে, দূর অতীত কাল থেকে আধুনিক কালেও, সেইসব পদ্ধতি ও প্রকরণ ব্যবহার করে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতার কোনো একটিকেও প্রমাণ করা যাবে না।

বাংলা গদ্য বলতে আমরা কী বোঝাব? মুখের ভাষার গদ্য নাকি লেখার গদ্য? এখানে 'ভাষা' শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই যদি 'যা বলা হচ্ছে' বুঝে নিই, তা হলে, এমন একটা সূত্র বা ছুতো কি তৈরি করা যায়— যা লেখা হচ্ছে সেটা, যে-উপায়ে, যা বলা হয় তার মত একটা আকার পায়, সেই উপায়কে গদ্য বলে?

ইংরেজিতে 'প্রোজ' আর 'পোয়েট্রি' শব্দদুটি নিজেরা 'আকার'টাই বোঝায়। যদিও এটা বেশ কৌতুককর যে গ্রিক ' প্রোজোইদিয়া' শব্দটি থেকেই ছন্দের তাল বোঝাতে 'প্রোজোডি' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে ও লাতিন 'প্রেজো ওর‍্যাসিয়ো' থেকে মুখের কথা বা খোলোমলো কথা বলতে 'প্রোজ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। কথার রীতি সাব্যস্ত করতে গ্রিকরা যে 'প্রোজোইদিয়া' শাস্ত্র তৈরি করেছিলেন, তা থেকে কথা বলাকে মুক্ত করতে লাতিনরা তাকেই মুখের কথা, 'প্রোজো ওর‍্যাসিয়ো' চিহ্নিত করে। আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও অনুরূপ ঘটেছে। 'ভাষা' বলতে বোঝাত যা বলা হয়।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস-রচনা সম্পর্কিত কোনো ভাবনায়— গ্রিক-লাতিন ও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে গদ্যের সংজ্ঞা নিয়ে এই মত ও বিশ্লেষণের পার্থক্য খুব জরুরি। যদি ধরে নেয়া যায় যে উনিশ শতক থেকেই বাংলা গদ্য ভাষার জনচর্চা শুরু হয়েছে, তা হলে, এটাও খুব পরিষ্কার করে কি মেনে নেয়া উচিত নয় যে গদ্যচর্চার সেই পর্বে এই দুটি আদর্শই আমাদের লেখকদের প্রভাবিত করছিল, অন্তত মোটামুটি ১৮৬০ সাল পর্যন্ত? ঐ ১৮৬০ সাল নাগাদই মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রবল দিকভাঙা বান

* প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ডাকালেন তাতে গদ্যের বা পদ্যের কোনো আদর্শ বা ছাঁচনির্ভর অনুশীলন, সে ইয়োরোপীয়ই হোক আর সংস্কৃতই হোক, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল ও সৃষ্টিকর্মের অদৃশ্য গভীরতা থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্যের আকার পূর্বনির্ধারিত হতে থাকল।

কিন্তু সেই ১৮৬০-এর আগের ৬০ বছরের ইতিহাসে এই আদর্শ-সংকট বা ছাঁচ নিয়ে দ্বিধা, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে, সমাজ সংস্কার নিয়ে নানা রকম ইস্তাহারে, কিছু বইপত্রে, নিবন্ধে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা আলাপ-আলোচনায় (ডিসকোর্স), বাংলা গদ্য-রাজ্য গঠনে, বাক্যগুলিকে মিলিয়ে বাচ্য তৈরিতে, বাক্যগুলি মিলিয়ে নিবন্ধ তৈরিতে বারবার ঘটেই চলেছে। সেই দ্বিধাচিহ্নগুলি চিনে নিতে না পারলে কি বাংলা গদ্যের ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব?

ঐ ৬০ বছরেরও আগে, আঠার শতকের শেষ ২৫-৩০ বছরের বেশ কিছু ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ ইংল্যান্ডের ও ফ্রান্সের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পাওয়া গেছে। সে গদ্য কি গদ্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? সে-গদ্যের গড়ন, যেহেতু, পূর্বোক্ত দুই মডেল বা আদর্শ বা ছাঁচ থেকে আলাদা ও সেই ছাঁচের সঙ্গে হুতোম ও আলালের গদ্যের গড়নের মিল খুব স্পষ্ট। তা হলে বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনার ভাবনায় কি এই বিশেষ ছাঁচটির কথা বিশদে আলোচ্য হওয়া অনিবার্য নয়?

তাহলে, বাংলা গদ্য বলতে কি আমরা কোনো সমগ্রতা অনুমান করতে পারি, অন্তত সেই ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো সমগ্রতা? সেই সমগ্রতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কি— আঠার শতকের চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ, উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরে শ্রীরামপুর মিশনের ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপা বইপত্র, ১৮১৮ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি ও ১৮২০-২২ থেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বাংলা বইপত্র?

বাংলা গদ্যচর্চার কি তেমন কোনো সমগ্রতা আছে অন্তত ঐ ১৮৬০ পর্যন্ত?

নাকি ঐ চারটি স্বতন্ত্র উদ্যোগের মধ্যে কোথাও কোথাও সংলগ্নতা থাকলেও এগুলো আসলে স্বতন্ত্র ইতিহাস ও সেই স্বতন্ত্র খণ্ডগুলি কোনো সমগ্রতা তৈরি করছে না?

আপাতত অনেকগুলি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে— অন্তত সাতটি। আমরা প্রথমেই বলেছি যে আমরা শুধু কিছু প্রশ্নই তৈরি করে তুলব। এ-ও আমরা বলে রেখেছি— যে-কোনো প্রশ্নই অন্য কোনো উত্তর থেকে জেগে ওঠে।

এই প্রশ্নগুলিও সেই পদ্ধতিতেই তৈরি হয়ে উঠেছে। বাংলা গদ্যচর্চার কোনো সামগ্রিক ইতিহাস রচিত হয়নি। বাংলা গদ্যের ইতিহাস— এই নিয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে লেখা কিছু বইয়ের বিবরণ আছে। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস— এই নামে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার বিবরণ আছে। বাংলা সাময়িক পত্রের নির্বাচিত সংকলনগ্রন্থ আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দুই খণ্ডে বিভক্ত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', বিনয় ঘোষের চার খণ্ডে বিভক্ত 'সংবাদপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', সম্প্রতিকালে স্বপন বসুর খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত 'সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' (এখনো অসম্পূর্ণ) ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুনতাসীর মামুনের পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকার সংকলন— এগুলি মূল্যবান আকর গ্রন্থ কিন্তু ইতিহাস নয়। ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান।

এই উপাদানগুলি ব্যবহার করে বাংলা গদ্যের কোনো সামগ্রিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা হয়নি।

তার ফলে কিছু অপ্রমাণিত সিদ্ধান্ত আমাদের এই বিষয়ক বিদ্যাচর্চার অভ্যাসের ভিতর ঢুকে গেছে। শুধু তাই নয়, শিকড়ও গেড়েছে। তার ওপর, গদ্যের ইতিহাস চর্চার একটা ইয়োরোপীয় মডেল আমাদের হাতের নাগালে আছে। তাতে এমন যুক্তিনিষ্ঠ বিবরণ আছে— পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ে জনবিতর্কে, রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রকাশ্য আলোচনায়, তেমন অলোচনার ভিত্তিতে সংবাদ-সাময়িকপত্র একালের প্রয়োজনবোধে ও তেমন প্রকাশ্য আলোচনার ফলে শাসক ও প্রতিষ্ঠানকর্তাদের সংকটবোধে, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় কীভাবে গদ্য তৈরি হয়ে উঠেছিল।

ইতিহাস-রচনার এই ছকটি আমাদের বিদ্যাচর্চায় বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রয়োগ করা হয়েছে এমন সহজ মিল কল্পনা করে নিয়ে যে সতীদাহপ্রথা রদ করার জন্য রামমোহন রায়ের আন্দোলনে, তাঁর ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠায়, বাল্যবিবাহরদ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগরের উদ্যমে, তাঁরই উদ্যোগে বিধবাবিবাহ আইন পাশে— ইয়োরোপের খ্রিস্টান ধর্মীয় জনমতের বিরোধের সমতুল্যতা আছে ও এই কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে যে আমরা এক বিদেশী শক্তি কর্তৃক পরাভূত ও শাসিত অধীনস্থ দেশ।

এই সমতুল্যতা যে কতটাই কল্পনাবিলাস ও কতটাই অপস্মারক তা ইয়োরোপের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায়।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে পারাক্লেসিস-এর দুটি ভূমিকায় দেসিদেরিউস ইরাসমাস তিনটি লক্ষের কথা বলেন। প্রথমত, ধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করতে হবে দেশী ভাষায়, মানুষের মুখের কথায়, যে-ভাষা চাষাভুষোরা, মেয়েরা, শিশুরাও বুঝতে পারে। দ্বিতীয়ত, ধর্মশাস্ত্র শুধু সাধারণ মানুষদেরই ধর্ম শেখায় না, যাঁরা ধর্মকর্মের অছি, সেই রাজপুরুষদের, ধর্মগুরুদের ও পুরোহিতদেরও ধর্মবোধ-বিচারের পদ্ধতি শেখায়। ইরাসমাসের তৃতীয় কথা ছিল— প্রাচীন লাতিন ভাষা ধর্মালোচনার যোগ্য ভাষাই নয়, অথচ হাজার বছর ধরে সেই ভাষাতেই ধর্মকে আটকে রাখা হয়েছে।

ইরাসমাসের এই কর্মসূচি ছিল সক্রিয়। সেই সময়ই ইংল্যান্ডে ওয়াইক্লিয়ের অনুগামীরা, বোহেমিয়াতে হাসসাইরা, ও সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র সব সম্প্রদায়, ওয়ালডেন-অনুগামীরা, ধর্মালোচনার ভাষার ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘ এক ব্যাপক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেই আন্দোলনেরই শীর্ষবিন্দু হয়ে ওঠে মার্টিন লুথারের বজ্রনির্ঘোষ। জন্ম নেয় ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষার গদ্য-আকার।

এই এক পর্ব-পর্বান্তর জুড়ে ইয়োরোপের ইতিহাসের উল্লেখটুকু করছি শুধু এই কারণে যে ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় গদ্যরূপের বিকাশের ভিত তৈরি করেছিল প্রবল সামাজিক আন্দোলন, বিদ্যাচর্চা ও সংগঠন। সেই সময়কার সংবাদ-সাময়িক পত্রের পাতায় ও অসংখ্য ইস্তাহারে তৈরি হয়ে উঠেছে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির গদ্যরূপের মডেল।

সেই গদ্যের ইতিহাসের মডেল বাংলা সাংবাদিক ও জনসংযোগের গদ্যে প্রযোজ্যই না। বাংলায় এই বিশেষ গদ্যের ধারাটি দীর্ঘকালীন কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলনের ফল নয়। সতীদাহরোধ, বাল্যবিবাহরোধ, বিধবাবিবাহপ্রবর্তন ও ব্রাহ্মধর্ম— সামাজিক ধর্মীয় দিক থেকে ভারতীয় জীবনের প্রায় হাজার বছরের আচার অন্ধতা থেকে মুক্তির নিশানা, ভূমিকম্পের মত। এক ধরনের নবজাগরণ সন্দেহাতীত ঘটছিল।

কিন্তু সাংবাদিক ও জনসংযোগের গদ্যের ইরাসমাস কথিত তিন লক্ষের একটি লক্ষও বাংলা সাংবাদিক ও জনসংযোগের গদ্যের লক্ষ ছিল না। চাষাভুষো, মেয়েদের ও শিশুদের বোধগম্য কোনো শাস্ত্রালোচনা বাংলা গদ্যে হয়নি। তার একটা কারণ হতে পারে যে ইয়োরোপে খ্রিস্টধর্ম তত্ত্বহিসেবে যে একটি অখণ্ডতার আধার, বাংলায় বা ভারতে হিন্দুধর্ম তা নয়। হিন্দুধর্ম বহুবাচনিক। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রান্তিক লোকধর্মের সংখ্যাও প্রচুর। হিন্দুধর্মের অনুগামীদের কাছে ধর্মতত্ত্বের চাইতে ধর্মাচরণ বা নিত্যকর্মপদ্ধতি অনেক বেশি ধর্মপরিচয়। যে-ধর্মীয় আলোচনা, বাংলা সাংবাদিক জনসংযোগী গদ্যে হয়েছে তাতে নতুন গদ্যের অনুসারীদের কোনো পক্ষই ধর্মাচরণ বা নিত্যকর্মপদ্ধতিকে খুব একটা আক্রমণ করেননি। তাই ধর্মতত্ত্বের যে সর্বজনীনতা ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির গদ্যরূপের প্রথম লক্ষ হিসেবে ইরাসমাস নির্দিষ্ট করেছিলেন তা বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

ইরাসমাস কথিত দ্বিতীয় লক্ষ— রাজপুরুষ, ধর্মগুরু ও পণ্ডিত-পুরোহিতদেরও ধর্মশাস্ত্র-আলোচনার দ্বারা বিচার করাও বাংলা গদ্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল না। শ্রীরামপুরের মিশানারিরা রাজপুরুষ ছিলেন না, বরং কোম্পানির সঙ্গে তাদের বিরোধই ছিল। তা হলেও তাঁরাও তো সাহেবই ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কেরি তো রাজপুরুষই ছিলেন। মিশনারি ও কোম্পানির সব সাহেবরাই 'উচ্চতর' সংস্কৃতির ও সভ্যতার স্বনির্বাচিত দূত ছিলেন। সাংবাদিক গদ্যচর্চায় দু-রকমের সাহেবদেরই নির্ভর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। হিন্দু আইনের অনুবাদও এই পণ্ডিতরাই করতেন। এটা বরং ছিল দুই 'ব্যুরোক্রেসির ঐক্য'। সাহেবদের সঙ্গে বামুনদের।

ইরাসমাস কথিত ইয়োরোপীয় সামাজিক গদ্যের তৃতীয় লক্ষও বাংলাগদ্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। কারণটা খুব সরল। সংস্কৃত পণ্ডিতরা যদি গদ্য লেখেন সে গদ্য সংস্কৃত নির্ভর তো হবেই। বাংলা সাংবাদিক গদ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার উনিশ শতক জুড়েই ছিল, একুশ শতকেও আছে। কিন্তু সেই সংস্কৃতপ্রাধান্যের মধ্যেই 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ও আরো কিছু কিছু কাগজে বাংলা কথ্যভঙ্গি কিছু-কিছু আসতে শুরু করে। কিন্তু সংস্কৃতনির্ভরতা থেকে বাংলা গদ্যের কোনো মুক্তি ঘটেনি। তেমন মুক্তি আদৌ সম্ভব কী না, কতদূর সম্ভব ও উচিত কী না এই তাত্ত্বিক তর্কেই সেই মধ্য উনিশ শতক থেকেই বারবার ফেঁসে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দার্থগত বা সেমানটিকসে ও বাক্যগঠনে বা সিনট্যাকসে যে অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল তার কিছু প্রমাণ সাম্প্রতিক কালে পাওয়া যাচ্ছে।

আঠার শতকের চিঠিপত্রে গদ্যভাষার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এমন অনুমান করাই যায় যে সংস্কৃতনিরপেক্ষ ও মুখের ভাষা-নির্ভর গদ্যভাষার ইশারা সেখানে ছিল। কিন্তু সাহেব-পণ্ডিত ঐক্য সে ইশারাকে গদ্যের উপাদানে পরিণত হতে দিল না।

সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি বলে কিছু বাংলা গদ্যে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখনকার বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতচর্চা তেমন হয়ই না বলা যায়। বাংলাদেশে তো একেবারেই সে-চর্চা নেই। কিন্তু একটি বাক্যের গঠনে (সিনট্যাক্স) পদগুলির অবস্থান ও বিভক্তি বা বিভক্তিতুল্য শব্দ প্রয়োগ করে বাক্যের পদগুলির ভিতর কারক-সম্পর্ক স্পষ্ট রাখার সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিই বাংলা বাক্যগঠনেরও অনতিক্রম্য রীতি। বিশেষণের বিশেষ্য-আনুগত্যের বাধ্যতা, লিঙ্গ-বচন-কাল নির্দেশের বাধ্যতা, বাক্যের ভিতরে পদের স্থানের নির্দিষ্টতার বাধ্যতা (এটা অবিশ্যি সংস্কৃত ব্যাকরণে নেই, এটা এসেছে ইংরেজি ব্যাকরণের তথা লাতিন ব্যাকণের, বাধ্যতা থেকে), শব্দের ধাতু ও গণের বাধ্যতা— এগুলো থেকে বাংলা গদ্য ও সাংবাদিক গদ্য অন্তত পুরো উনিশ শতক জুড়েই খুব শ্লথ গতিতে মুক্তি পেয়েছে। গদ্যের শুদ্ধতা নির্ণয়ে সংস্কৃতের ওপর নির্ভরতা বাংলা গদ্যের আদিযুগেও ছিল, আধুনিক যুগেও আছে। যেন, সেই শুদ্ধতায় অভ্যস্থ হওয়াটাই গদ্যশিক্ষা। যেন বাংলা গদ্য জ্ঞাননির্ভর, মুখের ভাষানির্ভর নয়।

আঠার শতকের যে-চিঠিপত্র এখন পাওয়া গেছে, তাতে মুখের প্রচলিত শব্দার্থ ও বাক্যগড়নের (সেমানটিকস ও সিনট্যাকস) ওপর নির্ভর করে বক্তব্য লেখার অভ্যেস তখন যে ছিল তা বোঝা যায়। এগুলি ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক চিঠি, টাকাপয়সার হিসেব ও কাজের কথার চিঠি, অর্থ বোঝানো ও বোঝাটাই এই চিঠিগুলির একমাত্র লক্ষ। তাই, সেখানে মুখের ভাষার যতটা কাছাকাছি লিখিত বাক্যের গড়ন (সিনট্যাকস) রাখা সম্ভব, ততটাই কাছাকাছি রাখতে হবে। ব্যাকরণ এখানে নির্ণায়ক ছিল না, বক্তব্যটাই এখানে নির্ণায়ক। ফলে, স্বাধীন এক সিনট্যাকস বা বাক্যনির্মাণ রীতি তৈরি হয়ে উঠছিল হয়তো।

ব্যাকরণের ত্রুটিতে বক্তব্যের বিকার সম্ভবই নয়। বরং বক্তব্যের স্পষ্টতা ব্যাকরণের চলিত অভ্যাসকে উৎরে যাচ্ছে বা শুধরে নিচ্ছে। এখন কাজে আঠার শতকের এই চিঠিগুলিতে শব্দার্থের (সেমানটিকস) নির্দিষ্টতাই অনেক সময়ই নিজস্ব বাক্যগঠন (সিনট্যাক্স) হয়ে উঠছে।

আমরা একটি দীর্ঘ উদাহরণ নিচ্ছি গোলাম মুরশিদ-এর 'আঠারো শতকের বাংলা গদ্য ইতিহাস ও সংকলন' বইটি থেকে। ইন্ডিয়া অফিস (লণ্ডন) লাইব্রেরি থেকে তিনি এমন অনেকগুলি দলিল, চিঠিপত্র, রশিদ ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে এই বইটিতে সংকলন করেছেন। আমাদের নির্বাচিত উদাহরণটিকে মুরশিদ 'হ্যাল-হেড ও বোগল'-এর সংগ্রহ বলেছেন। আমরা দীর্ঘ একটি উদাহরণ বেছে নিয়েছি এই কারণে যে রশিদ বা পরচা বা দলিল জাতীয় বাঁধা গতের রচনাকে গদ্য হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি থাকতে পারে ও সে-আপত্তির পক্ষে যুক্তিও আছে। কিন্তু এই উদাহরণটি একটি দীর্ঘ রচনা। রচনাটির মধ্যে ঘটনার পরম্পরা, বৈচিত্র্য, একটি মতের সমর্থন-অসমর্থন, কোনো ঘটনা নিয়ে লেখকের মত ও অমত— এমন নানা বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট। সেই কারণে— এটি চিঠি হলেও একটি সম্পূর্ণ রচনা হিসেবে বিচার করা যায়। আমরা প্রথমে মূল রচনা ও তার পরে এখনকার প্রচলিত গদ্যে, সেটি সাজিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ সরণং

মোং হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা

সে আড়ঙ্গের দালালসকল কএক সন হইতে মোকরর[১] আছে ইহারা কুম্পানির কাজ অনেক খতরা[২] করিয়াছে তাতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার[৩] পাইয়া তাহাদিগের[৪] উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও গোমাস্তা ও কোটীর[৫] দোসরা আমরা হায়ের[৬]-সঙ্গে এক এতফাক[৭] হইয়া মবলগ[৮] বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় করিতে পারে না এ কারণ আমি যুন্দর তজবিজ[৯] করিয়া তাহার দিগের কাজে হইতে জগির[১০] করিলাম আমার মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ[১১] কাজ করিতাম না কিন্তু দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদানির দফার জামিন কেহ থাকে না এ কারন এ কএকজন ফলানা[১২] সেখানকার নিকটাবর্ত্তি ও মাতবরিও আছে ইহাদিগের দালালিতে মোকরর[১৩] করিলাম।

নয়া দালালের দিগের কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে২ তাঁত নজর করিবেকও কাপড়ের রকম বুনিবার সময় তজবিজ করিয়া দেখিবেক খবরদারি[১৪] করিবেক জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়ও জে কিছু দাদানি তাঁতিদিগকে তুমি করিবা তাহার জামিন ওই নয়া দালালেরা হইবেক ওই জামিনির জন্যে দালালি খরচ বদস্দর[১৫] সাবেক থান করা জেমত২ মোকরর আছে তাহা

পাইবেক নয়াদালাল দিগকে আপন এক্তারি[১৬]তে দাদনি কএক টাকা হরগিজ দিবা না কারন এই এমত ধারার বেআন্দাজ[১৭] বাকী কদাচ হইতে পাইত না জদি মপশ্বল কুটীর আমলা লোক করার কিস্তিবন্দি[১৮] মাফিক[১৯] কাপড় বুঝিয়া লইতও মপশ্বল তজবিজ করিয়া দাদনি করিত অতএব এ হুকুম ও না পচন্দকাজের মহকুম[২০] হামেস গির[২১] জন্যে লিখিতেছি।

জদ্যপী কারবারের আনওান[২২] বদলির জন্য তোমার কাজ্য কথক তফাত পরিবেক জে ধারার কাজ করিতে হইবক ভাল বুঝিয়া তাহার আনওান নসিয়ত[২৩] মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা ও বেহতর[২৪] জানিলাম তোমার কাজ যুবিতামত[২৫] ও খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।

তোমাকে বেগর হেম্মত[২৬] ও এবাদতে[২৭] ও নেহাইয়ত চালাকিতে একাজ করিবা ইহা বেগর তোমাকে মোকরর করি নাই আমি একান্ত মোস্তাজর[২৮] থাকীলাম তুমি কাজ ভাল করিবা বিশেষত তোমাকে জোয়াদা মেহনত[২৯] আপন হাতে দাদনির কারন করিতে হবেক এ কারন সাবেক বরাওদ্দ[৩০]? হইতে দুই মুহরির[৩১] জেয়াদা[৩২] মোকরর করিলাম।

সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে[৩৩] দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকবিলায়[৩৪] তাতিকে দাদনি করিবা ও জখন তাতি কুটীতে কাপড় দাখিল করিবেক তখন দালাল কিম্বা দালালের তরৎ গোমাস্তা হাজির থাকীবেক এবং থান[৩৫] চুক্তির সময় তাতি সাক্ষাতে থাকীয়া চুক্তি করিবেক জখন থান খাম[৩৬] সোজ ধোলাই হইবেক সাবেক দস্তুর[৩৭] মত সেই সময় চুক্তি হবেক। জে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক[৩৮] রাখিবা জাবত তাহার এওজ[৩৯] কাপড় সরকারি গোছমত[৪০] দাখিল না করে জদি নমুনা সই কাপড় দাখিল করিতে না পারে তাবত ঐ ফেরত কাপড় কুম্পানির তরফ হইতে বিক্রি হইয়া তাতির নামে টাকা জমা হইবেক এ হুকুম হাজত[৪১] আছে জদি সরবরাহ যুন্দর মত হয় তবে বাকী হর গিজ পড়িবেক না জদি তাতি খবরদার না হয় ও কাপড় সরস না করে ও সরবরাহে খতরা করে গোমাস্তার নসিয়ত না যুনে ও এতো জেয়াদা কিম্মতে[৪২] ও বেগাফিল[৪৩] না হয় তবে তাহারদিগকে আনওান মত কাইকে সাজাই করিবা কি তুমি বেহুদা[৪৪] সাজাই[৪৫] জদি করহ তবে অতি তাতে তোমার নামে মোক্তারের নিকট নালিস করিতে পারিবেক এ হুকুম খুব তহকিক[৪৬] জানিয়া কখনো বদল করিবা না পহিলা[৪৭] তাতির জে রকম কাপড় দিবার করার করিবেক তাহার হাতে হরগীজ তাহার দুইথানের জেয়াদা দাদনি দিবে না তাঁতি এক থান দাখিল করিবার পূর্ব্ব আর এক থানের দাদনি করিবে না থান দাখিল হইলে পর দাদনি করিবা মালুম হইল তাতি ফিতাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড় দাখিল করিতে পারে না এই কারন ফিমাহা[৪৮] একবার সেওয়ায়[৪৯] দাদনি হইতে পারিবেক না।

সংপ্রতি খাজনা পৌঁছিলে পর এই মত দাদনির দস্তুর মাফিক করার বমৌজি[৫০]র তুমি দিবাও নায়েব গোমস্তাকে হুকুম করিয়া তাহার হাতে দেয়াবা এবং দাদনির দফায় তুমিও তোমার নাএব[৫১] কিছু গৌন[৫২] করিবা না অনেক লোক পূর্ব্ব আপন মুনাফার জন্যে তাতির খতরা করিয়া তাহাদিগকে আজিজ[৫৩] করিয়াছে জদি তুমি সে ধারা কাজ করহ তবে জেতাগাদি[৫৪] তোমার উপর বোর[৫৫] হবি।

এ কথা খুব এয়াদ[৫৬] রাখিবা তুমিও নাএব ও আমলা হয়ে[৫৭] জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় হরগিজ কেহ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না এবং খরিদের কারন দাদনি হইবে না।

পেটার[৫৮] আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বারহাটার নিকটে কারন সেখানকার আলাদা কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল[৫৯] করিবা সেখানকার তাতিলোক সদর কোটিতে সরবরাহ করিবেক কিন্তু দোসরা পেটার আড়ঙ্গ ধন্যখালি মায়াপুর রাজবন হাট কৈকানা কনিমা জয়নগর ও সকল জায়গার তাতিলোক সদর কোটীতে কাপড় দাখিল করিতে লাগিলে তাহার দিহের অনেক তছদিয়া[৬০]? হয় এ কারন সে সকল আড়ঙ্গ মোকরর থাকিবেক নাএব গোমাস্তা ও আমলাহায় দোসরা মাফিক তফসিল মনফুক[৬১] এই সকল নাএব গোমাস্তা আপন কাজে জায়গায়২ মোকরর হইয়া মাফিক হুকুম কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ করিবেন।

তোমাকে উচিত জে হামেসা পেটার আড়ঙ্গের কাজ নজর করহ মোকামি[৬২] গোমাস্তা ও দালালরা কি ধারায় কাজ করে এবং তাতিও পেটার আমলা দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ[৬৩] হয় কিম্বা তাতি তাতিতে মোকদ্দমা হয় তাহাও ফয়সল[৬৪] করিবা ফয়সল করিবার দফায় খুব সেতাবিও[৬৫] আদালত করিবা।

বেগর তোমার নিতান্ত খবরদারি ও মোকামি গোমাস্তা দিপের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত৬৬ কিছু লইবে না আর অবস্য কুম্পানির কাজ ভালমতে সরবরাহ হইবেক জদি তুমি এ দফার সাচা৬৭ হইতে পারহ তবে তোমার নেকনামি৬৮ হইবেক এবং জে উপজুক্ত তোমার দেলবরি৬৯ করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ তবে উপজুক্ত সাজাইতে পৌঁছিবা।

হুকুম জানিবা মাষ কাবার৭০ কাগজ সদর কুটীর ও পেটার কুটীর মাষ২ কলিকাতায় মোক্তারকারে৭১র নিকট পাঠাইবা সে কাগজের এই বেওরা৭২ লিখিবা মাষ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিওার৭৩ নামনবিসি৭৪ ও মজুত তহবিল এবং জে কাপড় দাখিল তাহার আলাদা হিসাব পাঠাইবা কোন রকম কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা করারের বাকি কাহার কতো তাহা লিখিবা কি কারন করারের বাকি পড়ে তাহারো বেওরা লিখিবা এ কাগজ হরেক৭৫ মাষের ত্রিষা তইয়ার৭৬ করিয়া দস্তখতি৭৭ যুদে আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাহ জখন খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন কতো টাকার দরকার তাহা দরজ৭৮ দিয়া লিখিবা আইন্দাম৭৯ জমা খরচী কাজ দুর করিবার কারন জে কিছু বাকি দালালের জিম্মে আখেরি৮০ মৌযুমেহইবেক তাহা আদায় করিয়া লইবা তাতিদিগের করার৮১ সাল তমামি৮২ সরার কাপড় আখেরি ফিবরিল নাগাদি দাখিল করিবেক তবেই তজবিজ ও ফয়সল কারন ত্রিষা আবরিল৮৩ যুদ্দা৮৪ তোমাকে আইযামে৮৫র ফোরসত৮৬ খুব মিলিবেক জদি এ কাজে কোন বকেড়া৮৭ রোয়দাদ হয় সিঘ্র মোক্তারকারে খবর লিখিবা

তাহার খোলাসা৮৮ হইয়া আইলে ফয়সল হইবেক ও ওজর ওছিলা৮৯ জারি হইবেক না আর তাতিলোক জে মাফিক করার করিয়াছে তাহার করার নামার নকল মনফুক করিয়া পাঠাই তাহাতেই পেটার আড়ঙ্গের করার মালুম হইবেক তোমার কাজ এই খবরদার হইয়া করার মাহফিক৯০ কাপড় আদায় করিয়া লইবা।

জদি নয়া রকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা৯১ হয় তাহার নমুনা মোক্তারকারের নিকট পাঠাইবা মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির কাজের উপজুক্ত হয় কিনা ও বেওরা লিখিবা কতো কাপড় ঐ নয়া রকমের সরবরাহ সালিয়ানা৯২ হবেক তাহার মাফিক জবাব লিখিবেন

ছোট মোকদ্দমা জে রোয়দাদ হইবেক তাহা ফল জন্যে তাহাদিগকে সমঝায়িা সালিস তুরায় রফা করিয়া দিবেক জদি তাতিলোক ইজারদারের নামে নালিষ করে কিম্বা ইজারদার তাতির নামে নালিষ করে তবে ঐ মত তাহাদিগকে সমঝাইয়া ১ সালিষ তুমি মোকরর করিয়া দিবা এক সালিষ সদর ইজারদার করিয়া দিবেক জদি ইহাতে মোকদ্দমা রফা না হয় তবে মোকদ্দমার তামাম৯৩ হকিকত৯৪ আরজি লিখিয়া মোক্তারকারকে খবর জানাইবা তাতিলোক সকলে গোল করিয়া নালিষ কারন জদি কলিকাতা জাইতে উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা কারন এই তাহাদিগের জাওনে খরিদের কাজের খতরা এবং মালগুজারিতেও খতরা হয় অতএব জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা না হয় তবে কলিকাতায় তাহারা গোল করিয়া না গিয়া আপন তরফ জনেক উকিল পাঠাইবেক সেই উকিল সকল তাতির হইয়া মালিকের কাছে ফরিয়াদ৯৫ করিবেক।

দালালের মারফত বাকী তিন সনের টাকা হিসাবে আন্দাজী ৯০০০ হাজার টাকা তাতি লোকের জিম্মে আছে এ বাকি উষুল করিবার জন্যে তুমি খুব মকেদী৯৬ করিবা জে উষুল হইবেক তাহা সাবেক দালালের দিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা সরহদ৯৭ কাপড় একসীযুত৯৮ না হওাতে অনেক কথা জন্মিয়াছে ও একসী না হওন কেবল গোমাস্তার কমতবদ্বদি৯৯ সংপ্রতি হুকুম লিখি তুমি কিম্বা তোমার খাতিরজমা মত জনের মাতবর লোক হপ্তা২ তাত সকল ও ভাল(?) ভরনিরযুত ভালো হাটাবার সময় বারিক১০০ ও একসী যুত তজবিজ করিয়া দিবা জেনো ভারিযুত ও ফড়্যা১০১ তানার মধ্যে না থাকিতে পায় আর বুনিবার সময় ভরনিরযুতেও কোন ফড়্যাদিগর আএব না থাকে ভরনিরযুতা বারিক হয় খবরদারি করিবা তাতি জেন আপন কেফাইতে১০২র জন্যে ভারিযুত পড়্যানের মধ্যে আনোনা(?) না করে সকল পাত একসী হয় এই সকল জন্যে কাপড় বেআন্দাজ হয় ও সরবরারে খতরা হয় তুমি খুব খবরদারিতে হরেক থান কাপড় তজবিজ করিয়া লইবা গজবর১০৩ ও গোছে হরগিজ

(পাণ্ডুলিপিটির পরবর্তী অংশ হ্যালহেডের সংগ্রহে নেই।

এখন আমরা এই রচনাটিকে এখনকার প্রচলিত গদ্যে লিখছি।

আড়ঙ্গের (কাপড়ের গুদাম) দালালরা কয়েক বছর ধরে কাজে নিযুক্ত আছে! এরা কোম্পানির কাজের অনেক ক্ষতি করেছে। তাঁতিদের ওপর এদের একচেটিয়া এক্তিয়ার। তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি (চালায়)। আর গোমাস্তা ও কুঠির অন্যান্য সব আমলাদের সঙ্গে মিলে নগদ, বাকি ফেলেছে। কিছুই আদায় করতে পারে না। এই কারণে আমি খুব ভাল করে ভেবেচিন্তে তাদের কাজ থেকে ছাঁটাই করলাম। আমার মনমত দালাল রেখে সব সময় খুশিমত কাজ করতে পারিনি। কিন্তু দালালদের ছাড়িয়ে দিলে কোম্পানির দাদনের জামিন পাওয়া যাবে না। সেই কারণে এই কয়েকজন অমুক-তমুককে (দালালি) দিলাম। এরা ওখানকার কাছাকাছি থাকে, চেনাজানাও আছে। এদের দালালিতে নিযুক্ত করলাম।

নতুন দালালদের কাজ এই (রকম)। মধ্যে-মধ্যে তাঁত নজর করবে ও বোনার সময় কাপড়ের রকম পরীক্ষা করবে, নমুনাসই হচ্ছে কী না দেখবে। তুমি তাঁতিদের যে-দাদন দেবে ঐ নতুন দালালেরা তার জামিন থাকবে। জামিনের জন্য দালালি-খরচের যা দস্তুর চালু আছে তারা তা পাবে। নতুন দালালদের সব সময় দাদনবাবদ টাকা দেবে না। এত বেআন্দাজ টাকা বাকি পড়ত না যদি মফস্বল কুঠির আমলারা শর্ত অনুযায়ী কাপড় কিস্তিবন্দি করে বুঝে নিত ও মফস্বলের খোঁজখবর নিয়ে দাদন দিত। সেই জন্য এই না-পসন্দ কাজের বিচার করে এই আদেশ জানাতে লিখছি।

যেহেতু কারবারের সুবিধের জন্য এই অদলবদলে তোমার কাজের কিছু তফাৎ হবে তাই যে-ধরনের কাজ করতে হবে তা ভাল করে বুঝিয়ে সুবিধাগুলির নির্দেশ দিচ্ছি। এটা ভাল করে বুঝে নেবে। তোমার কাজ যাতে ভাল ভাবে ও কুশলতার সঙ্গে করতে পারো সেই জন্যে সব খোলসা করে লিখছি।

তুমি দুর্বল ভাবে ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে নেহাত চালাকি দিয়ে কাজ সারবে এমন ভেবে তোমাকে নিযুক্ত করিনি। আমি একান্ত অপেক্ষা করে থাকব যে তুমি ভালভাবে কাজ করবে। বিশেষ করে তোমাকে নিজের হাতে দাদন দেয়ার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। সেই জন্য পুরনো বরাদ্দ থেকে তোমাকে দুই মোহুরি বেশি দিতে রাজি হয়েছি। সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি দালাল কিংবা দালালের গোমস্তার সামনে তাঁতিকে দাদন দেবে। তাঁতি যখন কুঠিতে কাপড় জমা করবে তখন দালাল কিংবা দালালের তরফে গোমস্তা হাজির থাকবে। থান কাপড়ের বেলায় তাঁতি সামনে থেকে চুক্তি করবে। যখন থান কাপড়ের পয়লা ধোলাই হবে, বরাবর যেমন হয়ে থাকে, তখনই চুক্তি হবে।

যে-কাপড় বাতিল হবে, সে-কাপড় কুঠিতে জমা করে রাখবে যদ্দিন-না সেই বাতিল কাপড়ের বদলে সরকারি চাহিদা-মত নতুন কাপড় জমা করে। যদি নমনুাসই কাপড় জমা করতে না পারে, তাহলে ঐ বাতিল কাপড় কোম্পানির তরফ থেকে বিক্রি করে তাঁতির কাছে প্রাপ্য টাকা শোধ হবে। এ হুকুমটি দরকারি। যদি সরবরাহ ঠিকঠাক হয়, তবে কাপড় বাতিল হবে না। তাঁতি যদি সাবধান না হয় ও কাপড় সরেস না করে, সরবরাহে ঝামেলা করে, গোমস্তার কথা না শোনে, খরচ বাড়ায় ও গাফিলতি করতেই থাকে, তবে তুমি সুবিধেমত তাকে সাজা দেবে। কিন্তু তুমি যদি অকারণে সাজা দাও তবে তাঁতি তোমার নামে মোক্তারের নিকট নালিশ করতে পারবে— এটা হুকুম থাকল। যাচাই-করা সত্য বদলাবে না। প্রথমে তাঁতি, যে-রকম কাপড় দেয়ার কথা, দেবে, সেই-মত কাপড়ের জন্য তাকে দুই থানের বেশি দাদন দেবে না। তাঁতি একথান জমা না করলে আর এক থানের দাদন দেবে না। থান জমা করার পর দাদন দেবে। মনে হয়, তাঁতি তাঁত পিছু দুই থানের বেশি কাপড় জমা করতে পারে না। এই কারণে প্রতি মাসে একবারের বেশি দাদন দিতে পারবে না।

এখন টাকা পৌঁছুলে নিয়মমাফিক দাদন দেয়ার ব্যাপারে তুমি জোর করবে। নায়েব-গোমাস্তাকে নির্দেশ দেবে সেই মত দিতে ও তাদের হাত দিয়ে দেওয়াবে। দাদন দেয়ার ব্যাপারে তুমি বা তোমার নায়েব দেরি করবে না। অনেক লোক এর আগে নিজের লাভের জন্য তাঁতিদের কষ্ট দিয়েছে। তুমিও যদি তেমন কাজ করো তাহলে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হব।

এ কথা খুব খেয়ালে রাখবে যে তুমি, নায়েব ও আমলারা, যারা সরকারের মাইনে পাও তারা, সব সময় মাইনে আগাম নেবে না এবং কোনো কিছু কেনার দরকারে কাউকে দাদন দেবে না।

মফস্বলি আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া যেহেতু দ্বারহাটার নিকটে তাই সেখানকার আলদা কুঠি না রেখে দ্বারহাটার সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। সেখানকার তাঁরা সদর কুঠিতে সরবরাহ করবে। কিন্তু অন্যান্য মফস্বলি আড়ঙ্গ— ধন্যাখালি, মায়াপুর, রাজবনহাট, কৈকানা, কনিমা, জয়নগর ও আরো জায়গার তাঁতিদের সদর কুঠিতে কাপড় জমা করতে বললে তাদের অনেক ঝামেলা হবে। সেই কারণে ঐ সব জায়গার আড়ঙ্গ যেমন আছে তেমন থাকবে। নায়েব, গোমাস্তা ও আমলারা হুকুম মাফিক ও তালিকা অনুযায়ী কাজ করবে। এই সকল নায়েব গোমাস্তা নিজের নিজের কাজের জায়গায় জায়গায় মোতায়েন থেকে তোমাকে যে হুকুম জানালাম সেই হুকুম মাফিক কাজ করবে।

মফস্বলি আড়ঙ্গের কাজ তোমাকে হামেশা নজর করতে হবে। ঐ সব জায়গায় যে-গোমাস্তা ও দালালরা থাকে, তারা কী ধারায় কাজ করে ও তাঁতি ও খুচরো কুঠির আমলা-দালালদের মধ্যে কোনো ঝুটঝামেলা হয় কী না কিংবা তাঁতি-তাঁতিতেও কোনো গোলমাল হয় কী না, তাও ফয়শালা করবে, ফয়শালা খুব দ্রুত করবে।

মফস্বলি কুঠিগুলির ওপর তোমার এই খবরদারির জন্য ওখানকার গোমাস্তাদের কাছ থেকে কোনো সেলামি বা ঘুষ নেবে না। এ কাজ তুমি ভালভাবে করতে পারলে কোম্পানির কাজের সুরাহা হবে। তোমারও তাতে সুনাম হবে ও তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব। কিন্তু যদি তুমি কিংবা আমলারা হুকুমের বাইরে কোনো কাজ করো তবে উপযুক্ত সাজা পাবে।

সদর কুঠির ও মফস্বলি কুঠির মাসকাবারি কাগজ মাস-মাস কলকাতায় মোক্তারকারের (ম্যানেজমেন্টর) কাছে পাঠাবে— এটা হুকুম বলে মানবে। সেই কাগজে এই বিস্তারিত বিবরণ লিখবে— মাস-মাস কত দাদন দাও, দাদন গ্রাহকদের নাম ও পাত্তা লিখবে, মজুত তহবিল এবং যে-কাপড় জমা পড়েছে তার আলাদা হিসাব পাঠাবে, কার কাপড় যাচাই করে (হুকুম বরাবর কাজ হয়নি বলে) কত ফেরৎ দেয়া হল তা লিখবে। কথা অনুযায়ী কার কত বাকি থাকল তা লিখবে। কী কারণে বাকি থাকল তারও বিবরণ লিখবে। এ-কাগজ প্রত্যেক মাসের তিরিশে তৈরি করে দস্তখত দিয়ে পরের মাসের সাত দিনের মধ্যে চালান করে দেবে। যখন খাজনা-তহবিল বেশি হয়ে যাবে তখন কত টাকার দরকার তা বিস্তারিত লিখবে। অগ্রিম জমাখরচের কাজ করবে না। সে জন্য দালালের জমাখরচের কিছু বাকি থাকলে শেষ-হিসাবে ঠিক হবে। সেটা আদায় করে নেবে। তাঁতিদের বছরওয়ারি বরাত শেষ ফিবরিল (?) নাগাদই দাখিল করবে। তা হলেই কাজ সুসম্পন্ন হবে। কারণ ত্রিশে এপ্রিল পর্যন্ত তোমার সময় থাকবে। যদি এ কাজে কোনো গোলমাল ঘটে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোক্তারদের (ম্যানেজমেন্ট) জানাবে।

সব খোলসা হয়ে গেলেই ফয়সালা হয়ে যাবে। আর-কোনো ওজর-অছিলা চলবে না। তাঁতিরা যে-কথা দিয়েছে সেই করারনামা (বা বায়নানামা) ভাল করে নকল করে পাঠাবে। তাতেই বোঝা যাবে— খুচরো আড়ঙ্গের করার (বা বায়না) কত। এই কাজ খবরদারি করে করতে পারলে করার (বা, বায়না বা কথা) অনুযায়ী কাপড় আদায় করে নেবে। যদি নতুন রকমের কাপড় খুচরো কুঠিতে তৈরি হয় তার নমুনা মোক্তারদের (ম্যানেজমেন্টের) কাছে পাঠাবে। মোক্তার পরীক্ষা করে দেখবে তাতে কোম্পানির কাজ হবে কী না। নতুন রকমের কত কাপড় বছরে পাওয়া যাবে তার বিবরণ লিখলে মোক্তাররা জবাব দেবে।

ছোটখাটো মোকদ্দমায় তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাড়াতাড়ি সালিশ করে মিটিয়ে দেব। যদি তাঁতিরা ইজারাদারের নামে নালিশ করে কিংবা ইজারাদার তাঁতির নামে নালিশ করে, তা হলে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তুমি সালিশ করে দেবে অথবা সদর ইজারাদার সালিশ করে দেবে। যদি এতে মোকদ্দমা রফা না হয় তাহলে মোকদ্দমার সব বিবরণ আর্জিতে লিখে মোক্তারদের (ম্যানেজমেন্ট) খবর জানাবে। তাঁতিরা যদি গোলমাল পাকিয়ে নালিশ করে ও যদি কলকাতা যেতে উদ্যত হয় তবে খুব আপত্তি করবে। কারণ, তারা এমন গেলে কাপড় কেনার কাজের ক্ষতি ও রাজস্বেরও ক্ষতি। অতএব যদি তাদের কোনো ফরিয়াদি সালিশিতে রফা না হয় তবে তারা দল বেঁধে কলকাতায় না গিয়ে নিজেদের তরফের কোনো উকিল পাঠাক। সেই উকিল সকল তাঁতির হয়ে মালিকের কাছে নালিশ করবে।

তিন বছরের আন্দাজ ৯০০০ টাকা দালালের মারফৎ তাঁতিদের জিম্মায় বাকি আছে। এই টাকা উশুল করার জন্য তুমি কয়েদ করবে। যে-টাকা উশুল হবে তা পুরোনো দালালদের বাকি (শোধ) হিশেবে জমা করে নেবে।

চুক্তি-অনুযায়ী কাপড় মিহি সুতোর না হওয়ার কারণ একমাত্র গোমাস্তাদের মনোযোগের অভাব। তাই তোমাকে হুকুম দিচ্ছি— তুমি কিংবা তোমার চেনাজানা মাতব্বর লোকজন তাঁতগুলি ও সুতোগুলি যথেষ্ট মিহি কী না তা পরীক্ষা করে দেখবে— যেন মোটাসুতো মিহিসুতোর ভিতর না থাকে। আর, বোনার সময় মিহিসুতোর ভিতর মোটাসুতো ঢুকিয়ে দেয়া না হয়। মোটাসুতো মিহিসুতো বলে চালানো হচ্ছে কী না তার খবরদারি করবে। তাঁতি যেন নিজে শস্তা করার জন্য মোটাসুতো বুনটের ভিতর না আনে। কাপড়ের পুরো জমি যেন একই রকম মিহি হয়। এই দোষে কাপড় বেআন্দাজি হয় (অর্ডার মত হয় না) ও সরবরাহে গোলমাল বাধে। তুমি অনেক থান কাপড় পরীক্ষা করে নেবে ও মাপ ঠিকমত আছে কী না দেখে নেবে, মাপ ও গোছ সব সময়...

(পাণ্ডুলিপির পরবর্তী অংশ হ্যালহেডের সংগ্রহে নেই।)

পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট প্যারা নেই বটে কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় লাইন ছেড়ে শাদা রাখা আছে। মুদ্রণে সেই জায়গাগুলিতে প্যারা করে দেখা হয়েছে। তাতে প্যারার কাজই হচ্ছে কিন্তু শাদা রাখা হয়েছে পাণ্ডুলিপি লেখার নিয়মেই। যদিও তাতে প্যারা ভাগের একটা সমতুল্যতা আছে, তবু সেটা রীতিসম্মত প্যারা নয়। না হলেও এখন ধরে নেয়া যেতে পারে যে প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে প্যারার সমতুল্য শাদা জায়গা রাখার রীতি পাণ্ডলিপিগুলিতে ছিল। শব্দগুলির অভিধানিক অর্থ সম্পাদক-সংকলক পাতার তলার দিকে একটু ছোট হরফে জানিয়েছেন। আমরা যখন রচনাটিকে এখনকার গদ্যে পুনর্লিখন করেছি, এই নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ সব জায়গায় ব্যবহার করিনি। হয় মূল আরবী-ফারসি শব্দটিই রেখেছি, এটা বুঝে, যে ঐ শব্দটিই, বাক্যটি বোঝার পক্ষে কোনো বাধা হচ্ছে না, নয় তো আভিধানিক অর্থের বদলে মুখ-ফেরতা কোনো শব্দ ব্যবহার করেছি। তেমন মুখ-ফেরতা কোনো শব্দ ব্যবহার করেছি। তেমন মুখ-ফেরতা শব্দ আছে অনেকগুলি।

এখন, মূল পাণ্ডুলিপিটি পড়ে তার অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ওঠা তিনটি কারণে কঠিন। প্রথম কারণ— লেখার বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞানতা। দ্বিতীয় কারণ— রচনাটির মধ্যে দাঁড়ি-কমার কোনো রকম সংকেত না থাকা। তৃতীয় কারণ— বাংলা গদ্যের বাক্য গঠনের আধুনিক কালের প্রচলিত রীতি থেকে এই রচনাটির বাক্যগঠন আলাদা।

মজার কথা হচ্ছে— এ চিঠিটিও সাহেবই লিখছে। সাহেবের চিঠি লিখে দিচ্ছে কোনো পত্রনবিশ। এই সব চিঠিলেখার ভাষা বা লব্ধ নিশ্চয়ই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। পত্রনবিশকে সেটা আয়ত্ত করতে হয়েছে ও তিনি পেশাদার পত্রলেখক। সুতরাং যাঁর চিঠি তিনি লিখছেন, তাঁর বলার কথা থেকে পত্রনবিশ সরে যেতে পারেন না।

তা হলে, বাচ্য বা সিনট্যাকস এখানে পূর্বনির্ধারিত। সেই ভাষা যাঁর আয়ত্তে তেমন মুন্সিও আছেন। কর্তা হিসেবে সাহেব সেই মুন্সি মারফৎ ভাষাটা ব্যবহার করছেন। সেই কারণেই তখন 'মুখতিয়ার' শব্দটি বেশি ব্যবহার হত। তাঁর কাজ শুধুই আইন-অনুযায়ী মুখপাত্রের।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি সংবাদ-সাময়িকপত্র ইত্যাদি ভাষা-ব্যবহারকারীরা পুরনো এই প্রক্রিয়াটি উল্টে দিলেন। আঠার শতকের ব্যবসায়ী সাহেবের কাজ ছিল ব্যবসার দরকারে তার নায়েব গোমাস্তাদের সঙ্গে কথা বলা। উনিশ শতকের মিশনারি ও সরকারি সাহেবদের কাজ ছিল— নানা উদ্দেশ্যে বাংলায় গদ্যভাষা তৈরি করা। তাঁদের কাজগুলো নতুন তাই কোনো তৈরি ভাষার কাছে তাঁরা গেলেন না। সাহেবরাও না, রামমোহন রায়ও না। রামমোহন ফারসি ভাষায় 'মীরাতুন আখবর' পত্রিকা প্রকাশ করলেন কিন্তু তাঁর নিজের গদ্য লিখলেন সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী। তিনি বাংলা ভাষায় লেখার যে-নির্দেশাবলি তৈরি করলেন তাও সংস্কৃত ইংরেজি মিলিয়ে তৈরি। আর সাহেবরা কর্তা→ক্রিয়া→কর্ম বাক্যের এই লাতিনি/ইংরেজি সংগঠনকে মাত্র কর্তা→কর্ম→ক্রিয়াতে বদলে নিলেন কিন্তু বাক্যকে করে তুললেন উপবাক্যনির্ভর (ক্লজ নির্ভর)। পাণ্ডুলিপির আরবী-ফারসি সিনট্যাকস (বাক্যগঠন) থেকে বাংলা গদ্য ছাপার হরফে একেবারে সরে এল। অথচ অর্থের দিক থেকে তো এমন কোনো দুরধিগম্যতা সত্যিই ছিল না।

আলোচ্য এই উদাহরণটিকে আধুনিক প্রচলিত অর্থে বোধগম্য করতে আমরা পুনর্লিখন করেছি। করতে গিয়ে প্রায় সব সময়ই আমরা বাক্যের আধুনিক সীমার ভিতর থাকতে পেরেছি। এই পারাটা প্রমাণ করে যে আঠার শতকের গদ্যের এই বাক্য তার গভীর সংগঠনে বাংলা বাক্যের মৌলিক গঠনের সন্নিহিত ছিল। সাহেব-পণ্ডিতদের গদ্য বাক্যের তেমন সন্নিহিতি ছিল না। অর্থকে সহজবোধ্য

করতে প্রায় কোনো সময়ই বাক্যকে ভাঙতে হয়নি বা একাধিক বাক্য জুড়তে হয়নি। আমরা উদারভাবে যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছি। কী নিয়ে লেখা হচ্ছে তা যদি জানা থাকে ও একটু-আধটু দাঁড়ি-কমা যদি মনে মনেও দিয়ে নেয়া যায়, তা হলে যেকোনো পাঠকের পক্ষে লেখাটি পড়ে ফেলা সম্ভব।

যে আরবী-ফারসি শব্দগুলি লেখাটিকে দুর্গম করেছে বলে মনে হতে পারে, তার অনেকগুলিই বাংলা শব্দই হয়ে গিয়েছিল ও পরবর্তী বাংলা অভিধানে শব্দগুলির অর্থও পাওয়া যায়— বিশেষত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, কাজী আবদুল ওদুদ ও যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিধানগুলিতে। কিন্তু এই 'অনেকগুলির' মধ্যে আবার বেশ কিছু মুখের ভাষাতেই থেকে গেছে, লেখার বাংলাতে এগুলো চলে না। এখনো চলে না।

সম্পাদক এই রচনাটিতেই ১০৩টি আরবী-ফারসি শব্দের তালিকা দিয়েছেন। তা থেকেই আমরা অনেক শব্দকে বাংলা বলেই চিনে নিতে পারি, অনেক সময় মুখের কথা হিসেবেও। যেমন— খতরা, এক্তিয়ার, মবলগ, তজবিজ, হরগিজ, ফলানা, খবরদারি, বেআন্দাজ, কিস্তিবন্দি, মাফিক, হামেশা, হেম্মত, এবাদত, মেহনৎ, বরাদ্দ, জেয়াদা, মোকাবিলা, থান, দস্তুর, কোরক(ক্রোক), গোছমত, কিস্মত, বেহুদা, সাজাই, পহেলা, ফি-মাহিনা, বেজার, ইয়াদ, সামিল, মোকামি, রোয়েদাদ, ফয়শালা, বেগর সেলামি, রসিয়ত, সাচা, হরেক, তৈয়ার, দস্তখতি, সালতামামি, ফুরসুত, বখড়া, খোলসা, অছিলা, মাফিক, পয়দা, তামাম, ফরিয়াদ, খাতিরজমা।

সম্পাদক-সংকলক ১০৩টি শব্দের 'বাংলা' অর্থ দিয়েছেন। সেই ১০৩-টি শব্দের ভিতর দু-চারটি আছে যৌগিক শব্দ। আবার, কোন কোন শব্দ এখনো বাংলা শব্দ হিশেবেই প্রচলিত সেটা গুনতে গিয়ে আমরাও দু-চারবার ঐ তালিকাবদ্ধ ১০৩টি শব্দের বাইরে গেছি। হয়তো কোথাও পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। তবু এই গোনাগুনতিতে এই হিসেবটা স্পষ্ট বেরিয়ে আসে যে ১০০টি আরবী-ফারসি থেকে গৃহীত বাংলা শব্দের মধ্যে ৫০টিই বাংলায় মুখের কথা হিসেবে এখনো ব্যবহৃত হয়। হিন্দু-বাঙালি ও মুসলিম-বাঙালিদের শব্দব্যবহারে পার্থক্য আছে। যদি মুসলিম বাঙালিদের শব্দ ব্যবহার থেকে আলোচ্য রচনাটির দুর্বোধ্যতা মাপা যায় তা হলে শতাংশের হিশেবে আরো বাড়বে ও এই রচনাটির মৌলিক ও বিশিষ্ট বাংলাত্ব আরো নিঃসংশয় হবে।

আঠার-শতকের শেষ পঁচিশ-তিরিশ বছরে বাংলা গদ্যের ব্যবহারযোগ্য একটি গড়ন ও উনিশ শতকের প্রথম তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর বাংলা গদ্যের একটি শিক্ষাযোগ্য গড়নকে কোন পদ্ধতিতে আমরা বিচার করতে পারি?

আমরা আঠার শতকের গদ্যের যে-নমুনা নিয়ে কথা বলছি তাকেই 'ব্যবহারযোগ্য' বলতে চাই। আর উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চর্চিত সাংবাদিক গদ্যের যে-নমুনা আমাদের খুব চেনা, তাকেই 'শিক্ষাযোগ্য' বলতে চাই। সেই শিক্ষার সংগঠন নিয়েও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে তোলা যায়।

এখন আমরা বুঝতে চাইছি 'ব্যবহারযোগ্য' গদ্যটির সংগঠন কী ছিল। সেই গদ্যে একটি বাক্য কী উপায়ে সংগঠিত হত। দাঁড়ি-কমাহীন এক-একটি বাক্য কোন অন্তর্লীন সম্পূর্ণতার শক্তিতে বোধগম্য হয়ে উঠত।

যেকোনো ব্যাকরণবিধিই একটি বাক্যের গঠনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সেই ব্যাকরণবিধি যখন স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে ওঠে, তখনই, ব্যাকরণবিধিই বাক্যের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাতৃভাষার দ্বারা ব্যাকরণ নিয়ন্ত্রিতা যাঁর মাতৃভাষা নয়, তিনি ব্যাকরণবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের আলোচ্য নমুনাটিতে মাতৃভাষার শব্দ ও গঠন দ্বারা বাক্যগুলি নিয়ন্ত্রিত বলেই তার অর্থ বোঝার জন্য কোনো দাঁড়ি-কমার কাজ করছে।

আমাদের নমুনাটির পুনর্লিখনে আধুনিক বাংলা গদ্যরীতি অনুযায়ী ১১টি বাক্যে যে প্যারাগ্রাফটি তৈরি করা হয়েছে, পাণ্ডুলিপিতে তা একটিমাত্র সিনট্যাকস বা সংগঠিত বাক্য। পাণ্ডুলিপির ছাপা চেহারায় একটা প্যারাগ্রাফের ভাব আসছে, তা ছাড়া সাদা জায়গাও ছেড়ে দেয়া আছে, প্রসঙ্গান্তর বোঝানোর একটা স্পষ্ট ইশারা আছে। কিন্তু যদি তা না-থাকত তাহলে প্রথম থেকে সিনট্যাকসের যে-প্রবাহ চলছিল তারই ভিতর পরের অংশটুকুও জায়গা হয়ে যেত। সিনট্যাকস বা বাক্যের নির্দিষ্ট গড়নই, নিয়ন্ত্রণ করছে বক্তব্যের পরম্পরা।

এখানে একটা বড় পার্থক্য ঘটে যাওয়ার ভয় থাকে 'সিনট্যাকস' বা 'বাক্য' শব্দটির মর্মার্থ ও প্রয়োগার্থের ভিতর ব্যবহারিক ব্যবধানে। 'সিনট্যাকস' পরিভাষাটির মূল অর্থ হচ্ছে— নিজেদের ভিতরের সম্পর্ক অনুযায়ী শব্দগুলির একটা সংযোগ তৈরি হয় ও তা থেকেই একটা অর্থ তৈরি হয়। 'সিনট্যাকস'-এর আর-একটি অর্থ— ব্যকরণ অনুযায়ী বাক্য তৈরির নিয়ম ও অভ্যাস।

সাধারণভাবে— এই অর্থ দুটি পরিপূরক। কিন্তু আমাদের এখনকার আলোচনায় এই দুই অর্থের ভিতরে একটা বিরোধ ঘটছে। কোন ব্যাকরণ অনুযায়ী নিয়ম ও অভ্যাস দিয়ে বাংলা গদ্যের বাক্য তৈরি হচ্ছে? আর, শব্দগুলির ভিতরকার সম্পর্কই বা কোন রীতি অনুযায়ী স্পষ্ট হচ্ছে? আর, সেই সম্পর্কই বা কোন সংযোগ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত হচ্ছে?

এখানেই আমরা কয়েকটি অনুমানে পৌঁছচ্ছি ও সেই অনুমানকে, আমাদের হাতে যে-তথ্য আছে, তার ভিত্তিতে প্রমাণের চেষ্টা করছি।

১. বাংলা জনসংযোগের গদ্য সাহেবদের ও পণ্ডিতদের মিলিত সক্রিয়তায় একটা নির্দিষ্ট সিনট্যাকস তৈরি করেছিল।

২. আঠার শতকের শেষ পঁচিশ-তিরিশ বছরে বাংলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট সিনট্যাকস তৈরি হচ্ছিল। সাহেব-পণ্ডিতরা সেই সিনট্যাকস মানলেন না। ফলে কর্তা-নির্ভর সমাপিকা ক্রিয়া ও সমাপিকা-ক্রিয়া নির্ভর বাক্য, যতিচিহ্নের ব্যবহারসহ, বাংলা সাংবাদিক গদ্যের সিনট্যাক্স হয়ে উঠল। অর্থাৎ এক-একটি বাক্যই হয়ে উঠল সিনট্যাকস।

৩. কিন্তু ১৮৩০-৩৫ এর পর থেকে নানা উপলক্ষে সরকারি নানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তিই হয়ে উঠল বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিষয়। সরকারের প্রতি আনুগত্য অথচ সরকারের বিবিধ ব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি— এমন একটি পরস্পরবিরোধীয় মনোভাবকে সামাজিক গদ্যের সিনট্যাকসে আকার দিতে হল।

৪. ইতিপূর্বে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই বিপরীত সিনট্যাকস ব্যবহার করেছেন। প্রধানত সতীদাহ প্রথাবিরোধী আইনের পক্ষে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ও সেই সূত্রে কলকাতা শহরের নাগরিক ঐহিকতার বিপরীতেও হিন্দুধর্মীয় আচারবিচারের ভিত্তিতে নাগরিক জীবনকে সংগঠিত করার চেষ্টায় অথচ সেই চেষ্টাকে সব সময়ই সরকার আনুগত রাখার দায়— এতগুলো বিপরীতকে তাঁর সামাজিক গদ্যরচনার নিয়মিত বিষয় করতে হয়েছে।

৫. ভবানীচরণের গদ্যভঙ্গির এই প্রাধান্যের আরো একটি বড় কারণ— তিনি সামাজিক গদ্যকে সংবাদপত্রের চৌহদ্দির বাইরেও ব্যবহার করেছেন। তখন সৃষ্টিশীল বাংলা গদ্য কিছু ছিল না। ভবানীচরণের নকশাজাতীয় লেখা অন্যান্য সাময়িকপত্রেও বেরত। ১৮২৫-এ তাঁর লেখা 'দূতীবিলাস' পুরনো বিদ্যাসুন্দরের গল্পের এক নাগরিক পুনর্লিখন। বিদ্যাসুন্দর'-এর চেনাজানা মালিনী ও গোপী বলে একটি চরিত্র 'দূতীবিলাস'-এ আছে। কিন্তু এর নায়িকা অনঙ্গমঞ্জুরী নামে এক বিবাহিতা ও গৃহস্থ মেয়ে। ঐ দূতীদের মারফৎ অনঙ্গমঞ্জুরী, শ্রীদেব বলে এক পরপুরুষের সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। ঐ অনঙ্গের এক পিসি অনঙ্গের স্বামীকে রাজি করায় যাথে অনঙ্গ পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক তৈরি করে সমন্তানবতী হতে পারে। পুত্র না জন্মালে পরলোকে পিণ্ড পাবে না, এই ভয়ে অনঙ্গের স্বামী অনুমতি দেয় ও অনঙ্গের এই পরপুরুষ অনঙ্গের স্বামীর বাড়িতেই অনঙ্গের সঙ্গে যৌনকর্মের অধিকার পায়। 'দূতীবিলাস'-এ হিন্দু-বাঙালির মধ্যে জনপ্রিয় একটি কাহিনিকে তৎকালীন নগর জীবনের পরিবেশে পুনর্স্থাপিত করা হয়েছে যে-ভাষায় ও ঘটনা বর্ণনায় তাতে এক উদ্ভট বিপরীতের ভিতর সামঞ্জস্য তৈরি করা হয়েছে। ১৮৩১-এ প্রকাশিত ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস'-এও এই বিপরীতের সংস্থান ঘটেছে। নববিবিও বিবাহিতা। তারও সংসার আছে। কিন্তু তার নিজেরই কথায়, 'যদি গোপনে এদিক ওদিক কোনো দিব চাই... বাটীর রসুয়্যা, ব্রাহ্মণ, কিংবা জলতোলা ভারী অথবা কুটুম্ব লোকজন কাহারও সঙ্গে কালেভদ্রে পিত্তরক্ষা নিমিত্ত আলাপ করিলে অভাগা মাগীগুলা কতই কয়, এত কি প্রাণে সয়, যেমন পাপিষ্ঠ ভাতার, তেমন তার আর ভাত খাইব না এবং গুরুজনেও যে-প্রচার ভর্ৎসনা করে তেমনই তাহাদিগকেও আক্কেল দিব।' নববিবি এরপর পেশাদার গণিকা হয়ে যায়। এক বুড়ি বেশ্যার কাছে খোলাখুলি বেশ্যাদের পেশাদারি যৌনক্রিয়ার কৌশল শেখে। এই শিক্ষাও কিন্তু এই রচনার পাঠ্য অংশ।

৬. এমন বিপরীতের সংস্থান ভবানীচরণের গদ্যরীতির গ্রাহ্যতা তৈরি করেছিল। এই সংস্থানের মধ্যে ছলনা ছিল। যেন শহুরে সমাজে পরিবারের ভেঙে যাওয়ার বিষয়ে লেখক অপেক্ষা করছেন বা তেমন পরিস্থিতির দিকে নজর টানতে চাইছেন। তখনকার সংবাদপত্রে এখন খবর কিন্তু চাপা হত— কোনো বাড়ির বৌ কীভাবে তার পরপুরুষদের কাছে চলে যাচ্ছে বা বাড়ির বৌ-রা কী ভাবে বাড়ির ঠাকুর-চাকরদের সঙ্গেও যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। এ-সব প্রকাশিত সংবাদের সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এমন সব কাহিনী লেখা ও সংবাদ তৈরির মধ্যে নতুন নাগরিক জীবনে নারী শরীরের পরোক্ষ আস্বাদনও একটা লক্ষ হিসেবে কাজ করত।

ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর ও ইংরেজি শিক্ষায় ভারতে বাঙালিরাই প্রথম শিক্ষিত হওয়ার পর আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের নানা নতুন আকার তৈরি হয়েছে। বাংলা গদ্যকে তেমনই একটি নতুন আকার ভাবা হয়। সেই ভাবনা আমাদের আত্মসচেতনতার শিকড়ও হয়ে উঠেছে।

সেই আত্মসচেতনতাতে অনেক বিস্মরণও ঘটেছে। ভাষার ও সাহিত্যের নতুন আকার যেমন তৈরি হয়েছে, পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত আকার তেমনি নষ্ট হয়েছে। সাম্রাজ্যশক্তির অধীনস্থ উপনিবেশের জীবনের সেই ধ্বংসের দিক সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস-চেতনা সজাগ হতে পারেনি, যদিও অর্থনীতি নিয়ে সেই চেতনা উনিশ শতকের শেষ থেকেই যথেষ্ট সবাক।

রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদী হিন্দুদের চর্চিত এক গদ্যভাষাই যে পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতার ও জনসংযোগের ভাষা হয়ে উঠল, সেই কারণেই কি সৃষ্টিশীল প্রাবল্যের পাশেই সেই গদ্য এমন সমালোচনাপ্রবণ, প্রায় কোনো কিছুকেই সমর্থন করে না, আত্মকথনবিহ্বল, শ্লথ, অতিকথাপ্রবণ, ক্ষুদ্রদৃষ্টি, যৌনবাচাল?

আপাতত এটাই শেষ প্রশ্ন।

SPELLING SHOULD BE PENSIONED OFF, IT TERRORIZES HUMAN BEINGS FROM BIRTH

Vivek Sahay*

One wonders what the late Nobel Laureate and the author of *One Hundred Years of Solitude* would have said about English pronunciation. In fact, the litany of complaints against the latter shows no sign of abatement. Recently, a friend of mine, in a rare fit of confession, owned up that she had been wrong about her pronunciation of the word 'epitome'- rhyming tome with stone and not with tummy- till an Anglophile tourist guide at a Greek ruin corrected her. Another admitted that the stubborn "P" 'mocks, burlesques (and I learnt a new word!) and levels phthisis, psychology, pthonic and pterosaur'. A friend who teaches English bemoaned that even knowledge of the origin of the words did not help much - though they were borrowed from French, the words *change*, *charge* and *chimney* are pronounced differently from *champagne, chevron*, and *chivalry*.

For most Indians, exposed to languages in which the basic written symbols or graphemes are quite consistent with the basic sounds or phonemes, (like *r* in ring or *a* in *a*go) the main function of the written word or orthography was to reduce in print how and what we speak . But the English had other designs for their orthography; it was to tell about the history of the word, its origin and evolution. In the process, if it helped in pronunciation it was good, if it did not, well, it was collateral damage. One can go a step forward and say that it was more of a canvas to paint the many facets of their personality and to depict their history. The story of the English Language could easily be passed off as the History of the English-Speaking Peoples.

At a cellular level, the English exhibited a streak of quirkiness by developing a script of 26 alphabets (with *u* and *j*, as distinct from *v* and / *i* being introduced in 16th century), after supplanting the old Runic alphabets of the Anglo- Saxons, even though they have at least 44 basic sounds to account for. The script has five vowels but they actually speak in 12 pure (monophthongs) and 8 gliding (diphthongs) vowels - thongs here are not what you are thinking! It has 21 consonants but by a combination of single and double alphabets, there are 24 consonant phonemes including *th* which has two sounds (different in *the* from *thin*). The alphabets *c*, *q* and *x* have been retained even though they could be represented by *k/s*, *kw* and *ks* respectively.

I am inserting this table of phonetics since I am sure most of us do check the dictionary from time to time but mostly to look up for meaning of words but not rigorously for pronunciation. This would probably help one understand when we are talking of more than 5 vowels and gliding vowels and the consonants - it will not be a bad idea if you could read this at least three times and pick out the monophthongs and diphthongs, before moving to the next paragraph.

* Inspector General of Police, Central Reserve Police Force

iː READ	ɪ SIT	ʊ BOOK	uː TOO	ɪə HERE	eɪ DAY	TEACHER: LILIAN VERGARA
e MEN	ə AMERICA	ɜː WORD	ɔː SORT	ʊə TOUR	ɔɪ BOY	əʊ GO
æ CAT	ʌ BUT	ɑː PART	ɒ NOT	eə WEAR	ɑɪ MY	ɑʊ HOW
p PIG	b BED	t TIME	d DO	ʧ CHURCH	ʤ JUDGE	k KILO	g GO
f FIVE	v VERY	θ THINK	ð THE	s SIX	z ZOO	ʃ SHORT	ʒ CASUAL
m MILK	n NO	ŋ SING	h HELLO	l LIVE	r READ	w WINDOW	j YES

To this alphabetical quirkiness, they added their dry sense of humour by triggering, on the one hand, similar pronunciation through different spellings like too, flew, and *through*, and on the other, dissimilar pronunciation through similar spellings like *over*, *oven*, *move* and *but*, *put* (which even made Dharmendra squirm much later in *Chupke Chupke*) - and the master of them all, the word ough which is celebrated in that line from Robert A Heinlein's "The Door into Summer" - '*though the tough cough and hiccough plough him through*'. The situation is analogous to a painter who is required not only to paint 44 colours from 26 pigments, but is also handicapped with a gnawing certainty that blue and yellow will not always add up to be green- sometimes they become magenta, sometimes white!! The roller coaster ride to confusion had truly begun.

No other people have so much history woven in their orthography as the British. So *i* in *pith* indicates its Germanic origin and *y* in *myth* its Greek. And it is in their spellings that their respect for Intellectual Property Rights of the language from where they have borrowed is reflected. Under Norman rule when the Anglo Norman French and the Parisian softer Francien divide existed, French loan words were altered so that harder Anglo Norman *c* replaced the softer *'ch'* and *charier* became *carrier*, *chauldron cauldron*. But later on, after the end of Norman rule, they made no such attempt- so it is with a French *sh* that one pronounces the *ch* in *champagne* and *chevron*, borrows and ties oneself

in knots with other words of foreign origin like the *cz* in Czech as well all as *pizza*, *lasso*, *czar*, *coyote*, *aardvark*, *lingerie*, *garage*, *cabernet*, *taupe* even if one encounters difficulty in speaking them.

Even though their phonotactics do not allow it, the markers like *ps*/ *pn*/*gn* were retained to indicate the Greek origin of words. Of course, to the Indians the British-Chini *bhai bhai* is a bit too much as English continues to incorporate too many tongue- twisting Chinese words at a frenetic pace like Bok choy, Wuxia, Souchong, Shih Tzu, cheongsam, Ch'i, etc.

One may be at one's wit's end to fathom why *accommodate* has an extra *c* and *m* and *misspell* an extra *s* and *l*, why a single letter *f* represents *gh* or *ph*, guess what *n* and *m* are doing in *damn* and *phlegm* respectively, and wonder how does *w* assist us to pronounce ans*w*er, s *i*sland, h Sara*h*, and *t* balle*t*. These silent letters do look like fiendish traps set all over to confound pronunciation.

However, it must not be forgotten that silent letters bear silent testimony to the British trait of being an extremely caring people. They help to distinguish between homophones, e.g *in*/*inn*; *be*/*bee*/*lent*; leant; *wright*/*right*/*write*/*rite*. They give an insight into the meaning or origin of the word (*vineyard* and not vinyard), provide useful information about pronunciation of other letters- the letter *e* in *cottage* and *bane* tells how *g* and *a* will be uttered respectively. They assist in improved diction by putting a weight on a certain syllable - the final [fe] in giraffe signals the second syllable stress whereas only giraf could suggest the initial stress on *r*.

Silent letters simplify clusters of consonants, largely due to *in situ* adoption of loanwords, like the silent *th* in as(th)ma, *t* in Chris(t)mas, *p* in (p)sychology, *m* in (m)nemonic, and *ph* in (ph)thalate - which is as soothing as a glass of chilled water after you have bit into a pungent Bhut Jolokia. Silent letters also complete the minimum letter requirement of three alphabets of *content words* (the nouns, most verbs, adjectives, and adverb state refer to some object , action, or characteristic), especially the ones containing fewer than three phonemes by adding phonetically redundant letters, such as *ebb*/*add*/*inn*/*be*/*buy, owe, etc*.

Of course the English overdid the silent letter stuff later in their passion for the classical languages, Latin and Greek, during 16/17th century English Renaissance period - unnecessarily added *b*'s to make *det debt* (to link to Latin debitum), and *dout doubt* (to link to Latin dubitare), *c's* to make *sissors scissors* and *site scythe*, *h's* to make *anchor*, *school* and *herb*, and due to misguided scholasticism an *s* to *island* (which someone wrongly thought to come from Latin insula). But let us be a bit charitable about that. People do try to show off - and the English were no exception to the rule. Anyway, this confusion created by adding a few silent letters is much less than than the verbosity the Latin zealots, derogatorily dubbed as 'inkhorns' had inflicted-*devaluate*, *ingent*, *attemptate*, *deruncinate*, *nidulate*, *abstergify*.

Silent letters are also emblematic of the British love for heritage with little utility or function - like their monarchy as some uncharitably mock. So within the folds of silent letters, they have enveloped many phonological museums- retaining sounds which they do not make no more . So *knight* is a hark back to the days when both, the *k* and the digraph *gh*, which had a throat clearing sound, were pronounced (the word itself being derived from *cneht* in Old English). *G* in *g*naw and *g*nome, *w* in *w*rite, *w*hen, *w*here and *w*rap, the final *b* in lam*b*, the median *t* in this*t*le and lis*t*en - all these had

ceased to be pronounced but were lovingly retained in the spellings. Infact, voiceless fricatives began to be pronounced like an *f* (e.g., laugh, cough) while *b* in *comb*, *dumb* and *l* in *talk*, *walk*, *folk* were dropped from around 16th century onwards.

This brings us to the main question- why did these things happen? It seems that for the better part of its history, English evolved in a manner that best describes life in a hostel of raucous boarders without regular wardens- utter chaos and confusion. There was no language synod such as the Spanish *Real Academia Espanola* or the French *Academie franchise* to act as a central pivot. Grammar remained in a flux-nothing remotely resembling Panini's *Ashtadhyayi*, or eight chapters or the foundational text of the grammatical branch of of the Vedanga, was ever developed. Even in the Old English phase (5th century AD to 11 th century AD), there were four main dialects; West Saxon, Kentish, Mercian and Northumbrian. West Saxon being the dominant, it was also called the Winchester standard.

Dialectical laissez faire however was at its peak for a period of 300 years beginning 1066 AD when England was ruled by French monarchs from Normandy who never spoke English! This Norman French rule substantially Frenchified English, added almost 10,000 Anglo- Norman words , greatly altered the largely phonemic orthography of Old English, and pushed it to the countryside from the court where it broke up into broadly five dialects, more spoken than written- Northern, West Midlands , East Midlands(a region which included present London) , Southern and Kentish. These dialects in turn had such myriad distinct regional usages that people in one part of England could not understand people from another part just 50 miles away. Latin, the language of the new Norman bishops and nobility, became the new 'language of serious writing" to the extent that even the Anglo-Saxon Chronicle, which along with Bede's *Historia Ecclesiastica gentis Anglorum* (the Ecclesiastical History of the English people) has been our greatest source of Old English, ceased to be written in English after 1154. So in less than a hundred years of the establishment of the Norman Rule, written English became a distant memory by the middle of the 12th century.

That the English took as much as 500 years more to inflict a Waterloo on the French speaks of their remarkable *sang froid*. That they persisted with their language in the face of the Norman molestations and did not give up like 'Celts did in Spain and France, as the Vikings did in Normandy, and France,... and countless others did in America" speaks volumes of their strength of character. But what is more remarkable, if you ask me, is how English, from such a chaotic start, could evolve into a world language and have strict Grammar Nazis and sticklers, glaring in a mother-in-law sort of disapproving way and sniping, in clipped accents, at fumblers of its spellings, pronunciation and syntax.

When the English collected their horses to put the language back on track after the passing of the Pleading in English Act of 1362 (curiously written in French language) which made English the only language for pleading in court proceedings, if not for maintenance of court record which continued to be maintained in Latin for sometime, the lack of a Central control informed the course they took. There were two famous books which signalled the re- birth of English in the sense that a) the books were written in English language after such a long time ; b) a very large number words of Old English and words used by the commoners (even though of foreign origin) were resurrected (*churlish*, *farting*, *miscarry*, *desk*, *edifice*, *injury*, *lecher*, *cradle*] to portray English as a confident language in its own right

and c) gave a fairly consistent spelling system. These were the *Canterbury Tales*, written in 1380s by the Father of Modern English *Geoffrey Chaucer* and the *English "Bible"* of *John Wycliffe* (1384).

Curiously, the resurrection of Modern English was made phonically inconsistent by the 120 odd clerks of Chancery set up in 1420 in Westminster to introduce English as the language of administration! (hence the term, Chancery Standard). The fairly consistent spelling system (e.g., *erly, hed, lern, beleve, resin*) seen in Chaucer's "Canterbury Tales" was diluted and changed to more phonically baffling versions by the Chancery clerks who were more comfortable with French than English. In addition to the unease with the English of the Chancery clerks, one major development that made pronunciation and spellings at odd ends was what was ironically undertaken to standardise them..

That development was printing, brought to England by *William Caxton* in *1476* with his "*The Recuyell of the Historeys of Troye*". Printing started in an era when England was beset with different dialectical regions as mentioned above, and there was very little orthographic harmonization. Church could be spelt 30 different ways, people in 22, receive in 45-not to mention, though much later on, Shakespeare in 80. Forget concord on spellings and pronunciation, there was little consensus on words itself- whether eggs or eggys or eyren.

Having lost touch with his mother tongue having been away from England for the preceding three decades, and assisted by bewildered Belgian assistants, Caxton chose the Chancery Standard which had become dominant owing to the political, cultural and commercial dominance of the East Midlands triangle (London-Oxford-Cambridge). Sometimes in the confusion, this merry band of printers borrowed the spelling of a word from one dialect and adopted pronunciation of another. So West Midland spelling of *busy* and *bury* were pronounced as the London Standard *bizzy* and Kentish *berry* respectively. But the printers were not finished yet.

The Dutch printers of William Tyndale, who translated the New Testament in English in defiance of a papal decree, would often change English spellings to match their Dutch orthography. A majority of these printers were Belgian, so while printing an alien language, they never let go away nostalgia- which they famously inserted through the letter 'h' in ghost (to match the Dutch gheest), aghast, ghastly and gherkin.

Despite these hiccups, there can be no denying the fact that spellings, with whatever little consistency with pronunciation, did continue to get fixed in the 100-200 years transition period from Middle English to early Modern period starting 1476. But this was also the period when huge changes in English pronunciation came about. So even as the spellings continued to be spelt as per their Middle English pronunciation, the English had stopped using g in gnaw, w in write and I in talk. The back of the throat sound (represented by the *ch* in German words like *ach*) that had been spelt by scribes with *gh* like in *laugh*, *night*, *eight* was also discontinued. Spellings continued to remain unaltered despite these changes, much like the scooterist in a slap stick comedy who continues driving oblivious of the riders on pillion seats having fallen off the vehicle! And then the English were subjected to a revolutionary linguistic development between 1350 and 1700 which substantially accounts for the oddities of the pronunciation.

This development is called the *Great Vowel Shift* (*GVS*)- that is to say, after fixing the spellings, the English proceeded to change the manner in which some long vowels were to be stressed, leaving the short vowels alone. This made pronunciation more idiosyncratic than ever before. What was pronounced as *shape* in Middle English (in the time of Chaucer) became *sheep; may, me; sheer, shire; maat, mate; lot, out; hoose, house; floor, flour, boot, boat; mood, mode*, etc— basically, the stress in the extant long vowels, which was hitherto akin to the Latin-derived Romance languages (French, Spanish, Italian, Romanian, Portuguese), changed.

Basically, 'the long vowel sounds of English(or tense vowels as Laird calls them) changed their values in a fundamental and seemingly systematic way, each of them moving forward and upward in mouth".

Let me illustrate with a small diagram of the CHAIN SHIFT

(a: →) æ: → e: → i: (→ əi) → ai and ɔ: → o: → u: (→ əu) → au which can be illustrated as Fast → Fad → Fed → Feed → Fear → Fire; and Fort → Foot → Food → Foe → Flout. Just try speaking them aloud and concentrate on the stress changes.

But these vowel changes took different shapes depending on their positioning of consonants around them— so *hoose* became *house* but *doom* did not become *doume* nor did *scoop scoupe* and *boob boube*. This was because the change in stress of *oo* to *ou* did not occur when placed before labial consonants like *m*, *p*, *b*. Processes like trisyllabic laxing and mergers were accelerated. Labial Consonants!! Trisyllabic laxing!! Mergers!! This is getting to be highly technical but just remember when anyone asks you why the pairs *mane-main, bred-bread, vein-vain* sound similar, why the ante penultimate syllable in *child-children*, *divine-divinity*, *mine-mineral* sound dissimilar, why the final *e* was lost so that made was no more pronounced *mah-duh*, why we get one spelling for many vowel sounds-*ea* in *knead*, *bread*, *wear*, and *great*, and multiple spellings for one vowel sound like *due and dew*, why the vowel *schwa*, (represented IPA symbol[9]) gained currency to become the most common vowel in English, why there was a an increased use of double vowels (e.g., *soon*), or of silent final *'e'f e.g., name*) to mark long vowels and double consonants to mark the preceding short vowel (e.g., sitting), or why *clean* and *lane* which rhymed during Shakespeare's time no more do, just raise your hand, stand up, say "due to the GVS" and pocket the prize.

And if some Smart Alec finds flaws in your argument, questions you as to why the *ar* sound of the Elizabethan period persists in *Derby*, *Berkley*, *Clerk* but not in *jerk*, *nerve*, *herd* and *serve*, why words like *uncouth* and *dour* maintain their pre-vowel shift pronunciation ("*uncooth*" and "*door*" rather than "*uncowth*" and "*dowr*"), why *food* is pronounced differently than *good*, *stood*, *blood*, and why there are different sound of '*o*' in *shove* and *move*, tell him that GVS impacted differently in terms of time and space and further that the English have rules and exception to rules in equal measure!

This brings us to the very interesting question- how far can the written word keep pace with the spoken which changes ever so often? Speaking itself is a faculty which Man developed much later in his evolution when his larynx, pushed deeper into this throat, made choking a possibility and also brought the possibility of articulated speech. It is an ability much more imprecisely developed than hearing.

We don't normally speak what we THINK we are saying- we say *laties* for *ladies*, insert a *p* between *m* and *t* in *warmth* to make it *warmpth*, make *something* sound *sompthing* and actually say *howvar you* instead of *how are you*. We tend to slur, especially names, and even vowels so that *necessary* becomes *nessree*, and *Salt Lake Solleke* - and even in Bengali so that we end up saying *bhallagena* instead of *bhalo lagey na* and *kamnachho* instead of *kemon achho*. When our tongues slide over words like rasam does on a banana leaf , we tend to chew off words from the beginning ('*stralia from Australia*) or the end (*mag from magazine*) or the middle (fo'c"s'*l*e from Forecast*l*e) and leave them as aphetic, apocopic and syncopic shreds respectively.

Speaking is not only imprecise, it is also affected by many other considerations- fashion, peer pressure, etc. And where is the guarantee that after we have made spelling consistent with pronunciation, the latter will not again change? It is *dance* today, tomorrow it could be *daahnce*. *Darling* today, *daahillng* tomorrow. There are already so many pronounced differences in accent amongst the English— the Scots, Americans, Australians and if you hop across to communities who speak English as their second language, pronunciation could go for a toss especially when in some of these tongues, some English phonemes could be totally absent.

If one takes Bengali for example, the language does not have anything to correspond to the English phonemes of the short vowel a - neither the first *a* of *A*merica nor the *o* of w*o*rd nor the *u* of b*u*t, the *v* of *v*ery, the *s* of *s*ix, *w* of *w*indow. So if we are to change the spellings as per Bengali pronunciation of English words, it could end up as a "*bherry beeg mishtak*'. The Japanese don't have an *l* so *elevator* is *erebeta*, *butter batta* and *salad sarada*. The Ukrainians have twisted the *haircut* to *herkot*, the Polish *ice-cream* to *ajskrym*, the Lithuanians *moving pictures* to *muving pickeris*. It would be expecting too much of spellings to continue to twist like these tongues.

Of course, English language reforms, specially the ones aimed at speaking the way we write, may have met with partial success and enabled us to arrive at our present pronunciation of *waistcoat* and *forehead* from the earlier *weskit* and *forrid*, but overall, spelling reforms, especially changing spellings to as we speak have been unfortunately, and if you will pardon me, as effective as AAP's political reforms in India. Besides, you cannot take away *k* from *knew* and not be confused it with *new*.

One of the lessons to be learnt from the success of English has been that there cannot be a guarantee that a high degree of spelling - pronunciation consistency will make a language easier to learn and become popular, Sanskrit, which has about the most phonemic of the known orthographies , would not have been a dead language which it is almost today and Bengali, which is not so phonemic, would not have been the second largest spoken language in the Indian sub continent. Another lesson is that the absence of a Central authority would not necessarily jeopardise the growth of a language but could infact give it a flexibility to, what a friend of mine says, "borrow, adapt, adopt, swerve, manoeuvre, negotiate, etc" - qualities needed in a language to grow and prosper.

A final word of advice - when in doubt about the pronunciation of a word , ask someone. You cannot always be expected to know that in *Loughborough*, the first *ough* sounds as in *cuff* and the second rhymes with *thorough*, and that *Leveson-Gower* could be '*loosen gore*'.

FURTHER READINGS

Bill Bryson: Mother Tongue- The Story of the English Language, Penguin 1990

WEBSITE

http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet
http://en.wikipedia.org/wiki/Silent letter
http://www.thehistoryofenglish.com
http://rationaiwiki.org/wiki/English spelling reform)
http://en.wikipedia.org/wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Siient letter
http://en.wikipedia.org/wiki/Three
http://www.thehistorygfenglish.com/historv early modern.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon Chronicle
http://en.wikipedia.org/wiki/English-language_spelling, reform
http://www.thehistoryofenqlish.com/historv middle.html
http://en.wikipedia.org/wiki/English-language spelling _reform
http://en.wikipedia.org/wiki/Chain_shift

বধ্যভূমি উপত্যকা— রাষ্ট্রের সন্ত্রাস ও হারিয়ে যাওয়া মানুষ

সিদ্ধার্থ গুহ রায়*

১৯৪৭-এ ক্ষমতা হাস্তান্তর পরবর্তীকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত অধ্যায় কাশ্মীর সমস্যা। এই সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসাবে সীমাবদ্ধ নেই। কাশ্মীরের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানেরও স্বার্থ জড়িত। তাই কাশ্মীর সমস্যা প্রথম থেকেই জাতীয় সীমারেখা অতিক্রম করে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ নিয়েছে। অথচ বিগত ৬ দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের শাসকরা এই সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হিসাবে সমস্যা ক্রমে তীব্রতর হয়েছে এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে কাশ্মীরকে তাদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কাশ্মীরের মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দু মাত্র সম্মান প্রদর্শন তাঁরা করেননি। কাশ্মীরের মানুষের ক্ষোভের উৎস কোথায় তার অনুসন্ধান না করে ভারত সরকার সমস্যাটিকে নিছক আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখতে চেয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে কাশ্মীর একটি রক্তাক্ত উপত্যকায় পরিণত হয়েছিল। কাশ্মীরের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক দাবিকে দমন করতে গিয়ে ভারত রাষ্ট্র এক নির্লজ্জ হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করে অবাধ হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ভারত সরকার সেখানে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছে। ১৯৯০-এর থেকে কাশ্মীরের সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর প্রবল উপস্থিতি কাশ্মীরের মানুষের মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছিল। ১৯৯৭ সালে জম্মু-কাশ্মীরে ৬ ডিভিশন সৈন্য, প্রায় ৯৫ হাজার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি এস এফ)-এর জওয়ান, রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৮০ হাজার এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্স (সি. আর. পি. এফ)-এর ৭০ হাজার সশস্ত্র কর্মী নিযুক্ত ছিল। তার ওপর জম্মু-কাশ্মীরে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সশস্ত্র কনস্ট্যাবুলারি নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যক 'বীর' মাত্র ৯০০০ আত্ম নিয়ন্ত্রণের সমর্থক কাশ্মীরী জঙ্গীকে দমন করতে ব্যস্ত ছিল।[১]

১৯৯০-এর দশক থেকে হাজার হাজার মানুষকে উপত্যকায় নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তাঁদের পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছেন। যাবতীয় ঘটনাই ঘটেছে রাষ্ট্রের মদতে। অথচ এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র।[২] প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত মানবাধিকার ও মানুষের মর্যাদার পরিপন্থী একটি আইন 'সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' (Armed Force Special Power Act) সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্ধত ও বেপরোয়া করে তুলেছে।[৩] এই আইনটির সবচেয়ে খারাপ দিক হল যে, এই আইন যাবতীয় বিচার-বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর দোষী সদস্যদের। এই ধরনের অব্যাহতি অবশ্যই অন্ততঃ কিছু মানুষের অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে, আর তাছাড়া এই ধরনের আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ স্পষ্ট করে তোলে যে, কেবল বহির্দেশীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেই নয়, নিজের দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সামরিক বাহিনীর ওপর, যা অবশ্যই সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী।

১৯৮০-র দশকের একোবরে অন্তিম লগ্নে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল উপত্যকা, মোটামুটি তখন থেকেই সেখানে সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর তৎপরতার সূচনা। আন্দোলন দমন করার এই তৎপরতাই ক্রমশঃ কাশ্মীরের মানুষকে ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। উপত্যকা যখন প্রতিবাদে উত্তাল তখন প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার উপায় হিসাবে রাষ্ট্রীয় দমন নীতি আরও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। চণ্ডীগড় থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল— 'রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, সাধারণ মানুষকে বন্দি করে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে উগ্রপন্থীর সংখ্যা যত, সেই অনুপাতে বন্দির সংখ্যা অনেক বেশী।'[৪] ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার জগমোহনকে জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল নিযুক্ত করে। অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক জগমোহন বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমেই উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তাঁর কাছে কাশ্মীর ছিল 'বৃশ্চিকদের

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩

উপত্যকা'। তিনি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়েই 'বৃশ্চিক' নিধনের কাজে লিপ্ত হলেন। তাঁরই পরামর্শে বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী উপত্যকায় পাঠানো হয়েছিল। জগমোহন রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পরই জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা পদত্যাগ করেন। কাশ্মীরের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করার বল্গাহীন স্বাধীনতা পেলেন জগমোহন। কাশ্মীরকে একটি রক্তাক্ত উপত্যকায় পরিণত করার প্রক্রিয়ার সূচনা জগমোহনের আমলেই ঘটেছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যাকে রাজনৈতিক বৈধ রূপ দেওয়া হয়।

জগমোহনের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং উপত্যকার সাধারণ মানুষের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে থাকে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে শ্রীনগরের পুলিশ সুপার এল. এ. চৌধুরী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাকুরা থানায় এফ. আই. আর পর্যন্ত করেছিলেন।[৫] কিন্তু অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার নেয়নি। ১৯৯০ সালের ৩১ মার্চ চূড়ান্ত অমানবিক ও অসভ্য একটি ঘটনা ঘটে। শ্রীনগরের বিচারনাগ এলাকায় একজন শিক্ষক তাঁর বাড়িতে বসে কয়েকজন ছাত্রকে পড়াচ্ছিলেন। ছাত্রদের গড় বয়স ১২। ছাত্রদের মধ্যে একজন মুসলমান, বাকিরা সকলেই অ-মুসলমান। মুসলমান ছেলেটির নাম নাজির সফি। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা শিক্ষকের ঘরে ঢোকে ও ছাত্রদের নাম জিজ্ঞাসা করে। নামের ভিত্তিতে তারা মুসলমান ছাত্রটিকে সনাক্ত করে এবং তাকে গুলি করে মেরে চলে যায়।[৬] এই অমানবিক ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে প্রতিবাদ হয় না। ১৯৯০ সালের ৫ই জুলাই জম্মু-কাশ্মীরে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন।' (Armed Forces Special Power Act) বলবৎ করা হয়। সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী উপত্যকায় নির্দয় হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আইনী স্বীকৃতি পেল। উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের সকলকেই প্রায় সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে দুটি নাম উল্লেখযোগ্য— একজন হৃদয়নাথ ওয়াং চু এবং অপর জন জলিল আন্দ্রাবী। সামরিক বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু বা হেফাজত থেকে গুম হয়ে যাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃদয়নাথ ওয়াং চু জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টে একাধিক রিট পিটিশন দাখিল করেন ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি সামরিক বাহিনীর হেফাজতে নিহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের একটি তালিকাও তৈরি করেন। রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতি ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর ওয়াংচুকে হত্যা করে। জলিল আন্দ্রাবী ছিলেন একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'কাশ্মীর কমিশন অফ জুরিস্ট'-এর সভাপতি ও একজন পেশাদার আইনজীবী। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইকে তিনি একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত করেন। ১৯৯৪ সালে আন্দ্রাবী জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের কাছে রিট পিটিশন করে সামরিক ও অসামরিক বাহিনীর হেফাজতে কজন বন্দী আছেন, কতজন নিহত হয়েছে, কতজন নিখোঁজ হয়েছেন, কি ধরনের অমানবিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁরা রয়েছেন ইত্যাদি বিষয় জানতে চান। ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ জলিল আন্দ্রাবীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ঝিলাম নদীতে ভাসতে দেখা যায়। জলিল আন্দ্রাবীর মৃত্যু প্রসঙ্গে কাশ্মীর টাইমস্ পত্রিকা লিখেছিল— 'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা, প্রতিবাদী মানুষ কাশ্মীরে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। আন্দ্রাবীর হত্যাকাণ্ড এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।'[৭]

সাম্প্রতিক অতীতে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর *Alleged Perpetrators: Stories of Impunity in Jammu and Kashmir* নামে একটি তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদেন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটির প্রস্তুতকর্তা International Peoples' Tribunal on Human Rights and Justice in Indian Administered Kashmir (IPTK) and Association of Parents of Disappeared Persons (APDP। জম্মু-কাশ্মীরে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর হত্যাকারীরা (Perpetrators) ১৯৮৯ সাল থেকে কিভাবে শাস্তি থেকে অব্যাহতি (Impunity) পেয়ে এসেছে, সে সংক্রান্ত মূল্যবান বহু দলিল ও নথির সংকলন এই প্রতিবেদন। জম্মু-কাশ্মীরের ৮০০০ মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন, ৭০০০০ মানুষ রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন, বহু মানুষকে অজানা জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়েছে। বস্তুত রাষ্ট্রীয় নথিপত্র ও দলিলের ওপর ভিত্তি করেই এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে বিগত ২০-২২ বছরের কাশ্মীরের ইতিহাস মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাসেরই নামান্তর। আর এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথা মানব নিধন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ভারত রাষ্ট্র। আইনের রক্ষকরাই সবচেয়ে মারাত্মক আইন লঙ্ঘনকারী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট বহু হত্যাকারীই শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

বস্তুত ঠিক কতজন সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য উপত্যকায় সন্ত্রাস চালানোর জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন তা নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। ১৯৯৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন— ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য মোট ২৭২ জন সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর সদস্য শাস্তি পেয়েছেন। ২০০৫ সালের ২৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ভি. কে. দুগ্গাল জানিয়েছিলেন, ১৯৯০ এর জানুয়ারি থেকে উপত্যকার মানুষের ওপর অত্যাচার চালানোর অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর ২১৫ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ মে সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এন. সি. ভিজ বলেছিলেন, উপত্যকায় বাড়াবাড়ি রকমের অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযোগে মোট ২০০০ নালিশ জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৩৫ জন সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে, আবার কেউ কারারুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মাত্র তিনদিন পরে ২০০৪-এর ২৪ মে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি প্রেস বিবৃতিতে জানায়— কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য মোট ১৩১ জন সামরিক বাহিনীর সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার বক্তব্য সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন ও স্ববিরোধী, বা মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে ভারত রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাব প্রমাণ করে।[৮]

উপরোক্ত তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনে (Alleged Perpetrators) মোট ২১৪ টি ঘটনার করুণ বিবরণ রয়েছে, যেগুলি প্রমাণ করে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী উপত্যকাকে বধ্যভূমি করে তুলেছে। ১৯৯০ সালের ১৬ই জুলাই সি. আর. পি. এফ জওয়ানরা ফয়াজ আহ্‌মেদ শাল্লাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আত্মীয় পরিজন তার আর দেখা পায়নি। শাল্লার পরিবার হাইকোর্টে মামলা করে। হাইকোর্ট ১৯৯৫ সালের ৩০ মার্চ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেয় এবং শ্রীনগরের এক সেশন জর্জকে তদন্ত অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৮ সালের ১২ মে তদন্ত অফিসার হাইকোর্টকে জানান যে ১৯৯০-এর ১৫ জুলাই ফয়াজ আহমেদ শাল্লাকে সি. আর. পি. এফ জওয়ানরা ফতে কাদাল অঞ্চলে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হরিনিবাসের একটি গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাকে আর দেখা যায়নি। হাইকোর্ট অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে বলে। ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীর সরকার ও রাজ্য পুলিশ বিষয়টি থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং জানিয়ে দেয় যে এ বিষয়ে তারা কোন দায়িত্ব নেবে না। আজ পর্যন্ত শাল্লা নিখোঁজ। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কারোর কাছেই কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই। হত্যাকারী যথারীতি অব্যাহতি পেয়ে গেছে।[৯]

এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা Alleged Perpetrators-এ তুলে ধরা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ও রাষ্ট্র-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগে উপত্যকার হাজার হাজার মানুষকে তুলে নিয়ে গেছে নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু এই আটক হওয়া মানুষগুলোর আজও কোন হদিশ নেই। কোথায় তারা হারিয়ে গেলেন তার কোন উত্তর নেই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে। যারা তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলল তাদের কোন জবাবদিহি করতে হয় না রাষ্ট্রের আইনের কাছে। উপরোক্ত প্রতিবেদনে এ রকম অভিযুক্ত ৫০০ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নামের তালিকা আছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায় না কারণ আইনি ব্যবস্থা নিতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমতি লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমতি পাওয়া যায় না।

এই হারিয়ে যাওয়া বা নিখোঁজ হওয়া মানুষগুলোর পরিবার নিয়ে একটু খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। গুম হয়ে যাওয়া পুরুষ মানুষগুলোর স্ত্রীরা উপত্যকায় আধা বিধবা (half widow) নামে পরিচিত। এর কারণ সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী তাঁদের স্বামীরা নিখোঁজ, সরকার তাদের মৃত ঘোষণা করেনি। ২০১১ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সে সময় কাশ্মীরে এরকম আধা বিধবার সংখ্যা ছিল কম করে ১৫০০। যেহেতু তাঁদের স্বামীরা রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত বলে ঘোষিত হননি, সেহেতু তাঁরা স্বামীর অবসরকালীন ভাতা বা অন্যান্য সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত। এই আধা বিধবা ও তাঁদের সন্তানরা অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।[১০]

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী পরিচালিত যৌন হিংসা উপত্যকাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল ১৯৯০-এর দশকে। ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে উত্তর কাশ্মীরের কুণাল পোশপোরা অঞ্চলে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা সেখানকার বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের ওপর গণধর্ষণ চালায়। কিন্তু অপরাধীদের আজও কোন শাস্তি হয়নি। এই জঘন্যতম অপরাধের বিষয়ে ভারতীয় নাগরিক সমাজের নীরবতায় এখনও কুণাল পোশপোরার মানুষের তীব্র ক্ষোভ রয়ে গেছে। প্রাক্তন সম্পাদক বি. জি. ভার্গিস-এর নেতৃত্বে

ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের একটি দল বিষয়টির তদন্ত করতে গিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর নির্দেশ অনুযায়ী তদন্ত কাজ সেরে প্রেস কাউন্সিল বিবৃতি দিয়েছিল— সমস্তটাই একটা 'বিরাট ধোঁকা' (massive hoax) এবং জঙ্গি ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের দ্বারা প্রচারিত একটা ডাহা মিথ্যা এই ধর্ষণের ঘটনা। অথচ ঐ অঞ্চলের ৩৩ জন মহিলা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছিল যে তাঁরা সকলেই ধর্ষিতা হয়েছেন।[১১]

বস্তুত সামরিক বাহিনীকে উপত্যকায় যা খুশী করার সাহস জুগিয়েছে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি। পার্লামেন্টে আইন পাশ করে তারা সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর হাতে গণহত্যা চালানোর অবাধ অধিকার তুলে দিয়েছে। এই আইনগুলি জারি হবার ফলে ভারতীয় সংবিধান গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন ও উপদ্রুত এলাকা আইন প্রয়োগ করে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় স্বীকৃত জীবনের অধিকার নাকচ করা হয়েছে। তাছাড়া এই আইন দুটি নাগরিককে সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুযায়ী আটক ব্যক্তিকে আইন সাহায্য পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই দানবিক আইনগুলির উপত্যকায় ব্যাপক প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে তীব্রতর করেছে। সশস্ত্র বাহিনীকে অপরাধমূলক আচরণ ও মানবাধিকার লঙঘনের জন্য যাবতীয় শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে ভারত রাষ্ট্র কাশ্মীরে গণতন্ত্রকে একটি প্রহসনে পরিণত করেছে। কাশ্মীর উপত্যকা একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে।

কাশ্মীরের অভ্যুত্থানের সূচনাপর্ব থেকেই দুটি সুস্পষ্ট পৃথক ধারার অস্তিত্ব ছিল— পাকিস্তানের মদতে ইসলামি মৌলবাদের প্রভাবে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তভুক্ত করার প্রয়াস এবং একটি ধর্ম নিরপেক্ষ মতাদর্শের ভিত্তিতে 'আজাদি'র জন্য লড়াই, অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি। কিন্তু ভারত সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি কাশ্মীরের বহু সাধারণ মানুষকে ক্রমশঃ মৌলবাদের দিকে নিয়ে গেছে। পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীরাই হয়ে উঠেছে উপত্যাকার সাধারণ মুসলমানদের শক্তির উৎস।[১২] ভারতীয় শাসকদলের ব্যর্থতা কাশ্মীর সমস্যাকে ক্রমশ জটিলতর করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র

১। Gautam Navlakha, 'Internal Militarisation Blood of the Tracks', *Econimic and Political Weekly*, February 8-14, 1997, p.299.

২। কাশ্মীরের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিষয়ে বিশদভাবে জানার জন্য দেখুন, সিদ্ধার্থ গুহ রায়, *কাশ্মীর: মুক্তি সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস— একটি সমকালীন ইতিহাস*, কলকাতা, ২০০৯।

৩। এই আইন সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, সিদ্ধার্থ গুহ রায়, *মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার: একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, কলকাতা, ২০১২, পৃ ১৪৫-১৫৫।

৪। *Tribune*, 22 June, 1989.

৫। Committee on Initiative on Kashmir, *India's Kashmir War*, March, 1990, পৃ. ৯-১০।

৬। People's Union for Civil Liberties (PUCL) and Citizens for Democrazy (CFD), *Report on Kashmir situation*, New Delhi, 2990, পৃ. ৯।

৭। Sumantra Bose, *The Challenge in Kashmir: Democracy, Self Determination and a Just Peace*, New Delhi, 1997, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

৮। IPIK and APDP, *Alleged Perpetrators: Story of Impunity in Jammu and Kashmir*, Srinagar, 2012, পৃ. ১১।

৯। ঐ পৃ. ২১-২২

১০। APDP, Half Widow, Half Wife: *Response to Gendered Violence in Kashmir*, Srinagar, ২০১১, পুরো প্রতিবেদন (Passim).

১১। *The Telegraph*, 15 July, 2013.

১২। *Kashmir Times*, 24 August, 1999.

বাংলা ও বাঙালির বিলুপ্ত বাঘ— স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্বপন মুখোপাধ্যায়*

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অগ্রপথিকদের অন্যতম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ তাঁকে 'বাংলার বাঘ' নামে অভিহিত করেছিল। সেটা নিতান্ত তাঁর দাপুটে ব্যক্তিত্বের জন্য নয়। তাঁর মেধা, তেজস্বিতা, স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনচেতা মানসিকতা, সর্বোপরি তাঁর নির্ভীকতার জন্য। কিন্তু তিনি কি শুধু বাংলার বাঘ? না, প্রখ্যাত ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সিলভান লেভি (Sylvain Levi 1863-1935) যিনি সারা পৃথিবীতেই সম্মানিত, তিনি বলেছিলেন স্যার আশুতোষ ফ্রান্সে জন্মালে, সে দেশের লোকেরা তাঁকেই 'ফরাসি বাঘ' নামে অভিহিত করত। প্রকৃতপক্ষে ফরাসি জনগণ সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লামাঁসো-কে 'ফরাসি-বাঘ' নামে অভিহিত করে থাকে। স্যার আশুতোষ পৃথিবীর যে দেশেই জন্মাতেন সে দেশের মানুষই তাঁকে সেদেশের বাঘ অভিধায় চিহ্নিত করত।

আমরা অনুসন্ধান করে দেখি, এর কারণ কী। রাজা রামমোহন রায়ই 'First Modern man in India', যিনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার চেয়েছিলেন। সেই ধারা এগিয়ে নিয়ে গেছেন বিদ্যাসাগর ও ঋষি বঙ্কিম। চার্চ মিশনারি সোসাইটি, উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান এবং মি: স্টিওয়ার্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এ দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর।

অবশেষে মেকলে সাহেব ১৮৩৫ এর ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর মিনিটস্-এ এ-দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সুপারিশ করলেন। তখন বাংলায় শিক্ষিতের হার ১% থেকে ১$\frac{১}{২}$%। মেকলে যুক্তি দিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলে মূর্তিপূজা বন্ধ হবে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম এ-দেশ থেকে বিলুপ্ত হবে। খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটবে। তিনি ইংরেজি-শিক্ষায় এক শ্রেণির মানুষকে শিক্ষিত করতে চাইলেন যারা হবেন শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র-শ্রেণি অর্থাৎ intermediaries, মেকলে তাঁর মিনিটস্-এ লিখলেন,—

"Interpreters between us and the millions whom we govern— a class of persons Indians in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."

মেকলের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। মূর্তিপূজার অবসান মানে হিন্দুধর্মের বিদায় অর্থাৎ শিক্ষা-বিস্তারের পশ্চাৎ-উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা। আর Filtration পদ্ধতিতে শিক্ষার বিস্তার।

মেকলের বক্তব্য মানতে পারেননি জেমস্ লং। তিনি বললেন, কবে এক শ্রেণি শিক্ষিত হয়ে নিচু স্তরে তারা শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবে, এভাবে অপেক্ষা করে থাকলে শিক্ষার প্রসার হবে না। এ যেন নদীতীরে গালে হাত দিয়ে বসে থাকা। কবে নদীর জল শুকোবে, তবে নদী পার হব। তিনি Adam's Report on Vernacular Education সমর্থন করে সরকারের কাছে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ১৯ জুলাই ১৮৫৪ উডস্ ডেসপ্যাচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিল। ২৪ জানুয়ারি ১৮৫৭ সিপাহি যুদ্ধের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। লর্ড ক্যানিং হলেন তার প্রথম আচার্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নামটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে নামটি অনিবার্যভাবে মনে আসে তা হল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এ কেবল আবেগতাড়িত বাঙালির অতিকথন নয়। ১৯২৪-এর ২৫ মে আশুতোষের মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন সেনেট হলের স্মৃতি সভায় নতমস্তকে বললেন,

Sir Asutosh was in fact the university and the university Sir Asutosh.

মেকলে যেভাবে সমস্ত ভারতবাসীকে সভ্যতার আলো বিবর্জিত অশিক্ষিত বলে উপেক্ষা করেছিলেন তার যোগ্য প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হলেন সরস্বতীর বরপুত্র, দেশপ্রেমী, তেজস্বী পুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাই দ্বারভাঙা হলের দোতলায় তাঁর মূর্তির নীচে দেশবাসী খোদাই করে লিখে দিয়েছে:

His noblest achievement surest of all the place for his mother tongue in stepmother's hall.

স্যার আশুতোষের পোষাক ছিল বিদ্যাসাগরের মতোই ধুতি আর ফতুয়া। চাদর সামলাতে পারতেন না বলে ধুতির উপরেই কোট! এই পোষাকেই গিয়েছেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর ওজস্বিতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সমুদ্রের মতো পাণ্ডিত্যের সামনে কেউ

* * বিশিষ্ট লেখক ও প্রাক্তন ছাত্র, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩

চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না। মেকলে সাহেব বেঁচে থাকলে তাঁকে স্বীকার করতে হত বাঙালির তেজস্বিতাকে তিনি চিনতে পারেননি।

সবার মনেই একটি প্রশ্ন জাগে, এমন কোমল হৃদয়ের বঙ্গজননীর কোলে, বাংলার নরম মাটির সবুজ প্রকৃতির নম্র অঙ্গনে এমন একজন দৃঢ়চেতা, অনমনীয় মেরুদণ্ডের মেধাবী সন্তানের জন্ম হল কী করে?

আশুতোষ তাঁর বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিকথা লিখে রেখে গেছেন, সেইসঙ্গে একটি সুন্দর বাঁধানো খাতায় প্রথম যৌবনের দিনলিপি। এই দিনলিপির মধ্যে পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ মেধাবী অপ্রতিদ্বন্দ্বী সারস্বত প্রতিভার অধিকারী আশুতোষের বড় হয়ে ওঠার প্রস্তুতি পর্বের প্রতিটি সোপান নির্মাণের অক্লান্ত পরিশ্রম। আমি একদিনের একটি দিনলিপির উল্লেখ করছি—

১৮৮৩-র নভেম্বর ১৫

''৬-টায় শয্যা ত্যাগ করেছি। যথারীতি সংস্কৃত পড়লাম বিশেষ করে ছন্দ; এটি এখন পুনর্গঠন প্রয়োজন। স্টেটস্‌ম্যান পড়া গেল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। Milton-এর Paradise Lost-এর ৮ম সর্গ সম্পূর্ণ শেষ করলাম, স্মৃতি থেকে প্রায় সবটাই আবৃত্তি করতে পারছি। কাকাবাবুর সঙ্গে Westfield Photographer-এ গিয়েছিলাম, ছবি তোলা হল, তাঁরা জানালেন negative চমৎকার হয়েছে। thaker's থেকে কাকাবাবুর জন্য Cotton's India কিনলাম এবং নিজের জন্য অন্যান্য বই কিনলাম। বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়ে ছিলাম। রাত্রে Cambridge Problem 1883 পড়লাম। শয্যা গ্রহণ ৯.৪০-এ।''

যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে আশুতোষ ছাত্র তখন গণিতে তাঁর গবেষণাপত্র Cambridge Messenger of Mathematics-এ প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় গণিতের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গণিতের উপর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। সি.ভি. রমন লিখেছেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আইনজ্ঞ হওয়ায় আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে একজন সেরা গণিতজ্ঞকে হারাল।

আশুতোষ বি-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ঈষাণ স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। ছমাস পরে এম-এ পরীক্ষায় গণিতে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরের বছর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও ফিজিক্সে এম-এ পাশ করেন। তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি বিষয়ে এম-এ পাশ করেন।

আশুতোষ গণিতের একজন গবেষক হতে চেয়েছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্য বাৎসরিক চার হাজার টাকার একটা অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে আশুতোষকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আশুতোষ ইংরেজ অধ্যাপকের সমতুল বেতন দাবি করেন। চাকরি হয়নি। শেষে স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছে শিক্ষানবিশি করেন এবং আইন ব্যবসা শুরু করেন। দুবার তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি বিচারপতি হন। স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছিলেন— আমি একজন গণিতের গবেষক হতে পারিনি তাই আমি 'Drifted to law'।

১৮৮৯ সালে তিনি প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সব থেকে কম বয়সের সভ্য হলেন। সেই সময় তিনি প্রস্তাব দেন বাংলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত একটি পত্র হোক। কিন্তু সেদিন তাঁর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এরপর ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ চার বার এবং ১৯২১ সালে আবার উপাচার্য হন। ১৯২৩-এ স্যার আশুতোষকে শর্তসাপেক্ষে উপাচার্যের পদ প্রদান করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তারজন্য বাঙালি চিরদিন তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে আহ্বান জানিয়ে তিনি আনন্দের সঙ্গে বলেন, আপনারা প্রস্তুত হন, এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ ক্লাশ খুলব। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিয়ে তিনি বাংলা প্রশ্নপত্র তৈরি করেন এবং বাংলা পাঠ্যক্রম বিষয়ে তাঁর সুপরামর্শ গ্রহণ করেন। নিজের ছেলে শ্যামাপ্রসাদ বি-এ অনার্সে ইংরেজি বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন কিন্তু স্যার আশুতোষের নির্দেশে বাংলা বিভাগের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শ্যামাপ্রসাদ এম-এ পড়েন বাংলায়।

স্যার আশুতোষের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা নিয়ামক ছিল। স্যার আশুতোষের উদ্যোগে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কেবল বাংলা ভাষা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তিনি ইন্ডিয়ান ভার্ণাকুলারস্— নামে একটি বিষয় এম-এর পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল ভারতের মধ্যে নয় বিশ্বের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে আহ্বান জানান। ব্রিটিশ সরকার আর্থিক অনুদান ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পালন না করলে স্যার আশুতোষ নিজের উদ্যোগে, অর্থে ও পরিশ্রমে নতুন নতুন বিভাগ গড়ে তোলেন। তাঁর অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি গড়ে তুললেন রসায়ান বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন, জগদীশচন্দ্র বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সি. ভি. রমন। এলেন ইতিহাসবিদ ভাণ্ডারকর, দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষণণ, ব্রজেন শীল। স্যার আশুতোষের প্রবল উদ্যোগে নতুন নতুন বিভাগ যেমন, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং আইন-কলেজ খোলা হল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করার জন্য ১৯১৩, ২৮ অক্টোবর সিন্ডিকেটের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর খবর পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন। স্যার আশুতোষের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বাঙালি এক লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেল। আমাদের দেশের সব সম্মান পাওয়া যায় বিদেশ থেকে সম্মানিত হবার পর। আমাদের এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে ডি. লিট ডিগ্রি দান স্যার আশুতোষের আর এক অনন্য কীর্তি। সেনেটের সভায় যখন তাঁকে ডি. লিট প্রদান নিয়ে ভোট হয় তাতে প্রথমে দেখা যায় প্রস্তাব বিপুল ভোটে নাকচ হয়ে গেছে। এরপর যখন স্যার আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের বাংলাসাহিত্যে অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে সভ্যদের সামনে ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেন তখন দেখা যায় বিপুল ভোটে সেই প্রস্তাব সমর্থন পায়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি ১৯২১ সালে নিজের মায়ের নামে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ সারা জীবন যত কাজ করেছেন তার যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল এমনকি তাঁর সংগৃহীত ছবি, 'কাটুম-কুটুম' সব শেষ জীবনে নিলামে বিক্রি করে দিতে চান। আর্থিক দৈন্য তাঁকে এমনভাবে মানসিক অবসাদের শিকার করে যে তিনি একটি হ্যান্ডবিল ছেপে সব নিলামে বিক্রি করার জন্য আবেদন করেন। একথা জেনেই স্যার আশুতোষ অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে বোঝান যে এই কষ্টের শিল্পকর্ম বেচে দিলে তিনি আর বাঁচবেন না। নীরব থাকেন এই অভিমানী শিল্পী। এতবড় শিল্প প্রতিভার এই পরিণতি হতে পারে না। স্যার আশুতোষ বললেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার চাকরির ব্যবস্থা করছি। আপনি হ্যান্ডবিল তুলে নিন। স্যার আশুতোষের আবেদন মতো কাজ করেন এই বিশ্বশ্রুত প্রতিভাবান শিল্পী। তিনি স্যার আশুতোষের কাছে এত কৃতজ্ঞ ছিলেন যে আশুতোষের মৃত্যুর পর এই মিতবাক শিল্পী বলেন—

''আজ তিনি (আশুতোষ) নেই এখন লুকোবার প্রয়োজনও নেই। আমি স্যার আশুতোষের চাকর ছিলাম।''

বাংলার সমস্ত বিদ্যোৎসাহী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে স্যার আশুতোষ নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ন্যাশানাল লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তিনি লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, এডিনবার্গ প্রভৃতি স্থানের ম্যাথমেটিকাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত গণিতশাস্ত্রী গণেশপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষে ভাস্করের পর এত বড় গণিতজ্ঞের জন্ম হয়নি।

আইনের জগতেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। হিস্ট্রি অব জুরিস্প্রুডেন্স এবং সায়েনটিফিক ও অ্যানালিটিকাল জুরিসপ্রুডেন্স-এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিচারক হিসেবে রায় দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখিত হয়ে থাকে। শূদ্রদের জারজপুত্রদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর স্বীকৃতিদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইনের ছাত্র হিসেবে তিনি নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ১৮৮৪, ৮৫, ৮৬ পরপর তিন বছর টেগোর ল স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর আইনের উপর এই ব্যুৎপত্তি বিচারক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল।

তাঁর মেধা, কর্মোদ্যোগ, দেশপ্রেম, ওজস্বিতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ। ১৯২৩ এ যখন স্যার আশুতোষকে আবার শর্তসাপেক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন বাংলার গভর্নরকে একটি পত্র দিয়ে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সেই চিঠির মধ্যে স্যার আশুতোষের তেজস্বিতার যে অনবদ্য দ্যুতি বিচ্ছুরিত তারই জন্য প্রধানত বাংলার মানুষ তাঁকে 'বাংলার বাঘ' নামে অভিহিত করে। তিনি লিখলেন:

"I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, an answer which you and your advisers expect and desire: I decline the insulting offer you have made to me."

সারস্বত প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের এই অনমনীয় দৃঢ়তা আজ প্রায় বিলুপ্ত। এ অবক্ষয় শুধু বাংলায় নয় সমস্ত বিশ্বেই বেদনার কারণ। তবু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এমন হিমালয় প্রতিম চরিত্র-মাধুর্য প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ এ স্যার আশুতোষের ১৫ তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে যে প্রণাম জানিয়েছেন, সেই প্রণামে নত হই আমরা—

বাঙালির চিত্তক্ষেত্রে আশুতোষ
বিদ্যার সারথি
তোমারে আপন নামে সম্মানিত
করেছে ভারতী।
প্রবল প্রভাবে তব বঙ্গবাণী
বাহনের রথ
জ্ঞানঅন্ন বিতরণে লভিয়াছে
অন্তরের পথ
তব জন্মভূমি তলে। কবি সেই
বাণীর প্রসাদ
পাঠায় উদ্দেশে তব বঙ্গজননীর
আশীর্বাদ।

UNVEILING IN THE NEW PUBLIC SPHERE: NARRATIVES OF TRANSGRESSION BY MUSLIM WOMEN IN THE WORLD OF BLOGS

Tajuddin Ahmed*

The veil is certainly one of the most debatable issues in the domain of postcolonial and feminist studies. As much as the veil is an article of clothing, it is also a concept, often performing the role of an emblem. Miriam Cooke in her important work *Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Islam*, has foregrounded the shifting significance of the act of veiling/ unveiling through an account of an event in which Muslim women had to witness helplessly as the connotations of veiling changed rapidly. It involves two middle-class female professors from Kabul, Fatima and Zaynab, immediately before the Talibans came to power on September, 1996. Zaynab had decided to put on her ritual scarf as she was confident that the choice was with her. But Fatima thought otherwise and she accused Zaynab of false consciousness.

> Zaynab retorted that Fatima had not understood her. She was sanguine that the veil could not be used against her since it was she who had freely chosen to assume it. ..."I might take it off tomorrow!" They turned on the radio Kabul: the Taliban have come to power. One of their first acts is to curtail women's rights: women must be totally covered... (Cooke 124)

Veiling; Shifting and Ambivalent Connotations

Scholars of cultural studies regard veil as a symbol of both oppression and resistance, of empowerment and helplessness. In the emergent scholarship on the marginal and marginality, the issue of veiling is interpreted in conjunction with the arguments involving identity, colonialism and patriarchy. Jennifer Heath in her study *The Veil: Women Writers on Its History, Lore, and Politics* has pointed at the variations and contradictions with which the idea of veiling is riddled. According to her, the veil can be, "illusion, vanity, artifice, deception, liberation, imprisonment, euphemism, divination, concealment, hallucination, depression, eloquent silence, holiness, the ether beyond consciousness, the hidden hundredth name of God, the final passage into death, even the Biblical apocalypse, the lifting of God's veil, signaling so-called end times" (3). In the Indian context, the practice of purdah, equivalent to the idea of veiling, is not just laced with ambivalence and contradiction. It "is not merely a form of dress or custom, but is indicative of a whole social system" (Jain 1). Eunice Desouza in the introduction to her seminal work *Purdah: An Anthology* has pointed at the heterogeneity of the factors which have contributed to the survival of the practice and are therefore indicative of the complexity of this religio-cultural practice: " A wide variety of reasons for purdah exists: religious injunction, notions of female behaviour, group solidarity and defensiveness about identity, the control of sexual impulse in men and women, status, family honour and respectability, and, where women have

* Assistant Professor, Department of English, Aliah University, Kolkata

property rights, the fear that misalliances would lead to the depletion of property" (xii). Jasbir Jain and Amina Amin have argued that purdah or veil has come to stand for the dividing line between tradition and modernity and has inherited the complex value structures associated with the word tradition. But Jain and Amin have also drawn attention to the fact that, the concept and practice of veiling, "carries both positive and negative connotations" (vii).

This ambivalence and alterations in the significances of veiling can easily be understood from the recent history of Iran. During the regime of the Shah, when the state encouraged and sponsored the westernized manner of life women removed their veils as a sign of modernization programme. Later, when there was opposition to the reign of Shah in all spheres of private and public life, women once again started to wear the veil as an expression of their resistance. However, even after the establishment of the Islamic state, Iranian women continued to wear veils as they were continuously reminded of the honour of the nation which according to the Islamic state depended on these women remaining veiled. Today, for the Iranian women, "veiling demonstrates submission to a new nationalistic state" (Bulbeck 32). Orhan Pamuk's novel *Snow* depicts the plight of some young Turkish women from the provincial border-town of Kar. Mostly students in colleges and university they had committed suicide after being forced to remove their *hijab* or headscarf. The novel problematizes the essentialist readings, preferred by both the Secularists and the Islamists as such readings of this religio-cultural custom fit well to their own scheme of things. In the Indian context, the Begum of Bhopal's gradual change in attitude towards veiling is emblematic of the way educated Muslim women tried to negotiate the diverse significances of veiling. In 1922 she opposed any possibility of Muslim girls shedding purdah and attending co-educational schools. Several years later, she would declare in a report to the All India Women's Conference: "The present strictness of purdah system among Muslims does not form part of their religious obligations. The Mussalmans should coolly and calmly decide whether by respecting a mere custom they should keep their women in a state of suspended animation" (qtd. in Lateef 78). Finally, in 1929, when she presided over AIWC session, she removed her veil in a public and symbolic gesture. In this backdrop of shifting significances one can easily understand that the physical gesture of unveiling is inseparably linked to the idea of unveiling of the mind. Not surprisingly Fatima Mernissi, feminist writer from Morocco and one of the most important contemporary Muslim sociologists, explicates her plan of calling into question the patriarchal reading of the Holy Quran with an image of lifting a veil: "So let us raise the sail and lift the veil - the sails of the memory-ship. But first let us lift the veils with which our contemporaries disguise the past in order to dim our present" (Mernissi 11). Mernissi's almost-lyrical declaration to " raise the sail" and "lift the veil" echoes the same strength of resolve that was heard in the slogan raised by Nawal El Sadwai, Egyptian feminist writer, activist, physician and psychiatrist, a slogan that later became the mission of the Arab Women's Solidarity Association : "Removing the veil from the mind" (qtd. in Cooke 134).

Removing the Veil from the Mind: The Activities in the Virtual World

Taking cue from this idea of "removing the veil from the mind", one can locate another form of unveiling taking place in the world of weblogs and the principal participants in this act which denotes an intention to be visible to and be heard by the wider world are Muslim women. Innumerable posts

from Muslim women, mostly using pseudonyms, have flooded the blogosphere in the recent years. Although a good number of these posts are by women from the Indian subcontinent, Muslim women belonging to more conservative societies of Middle East and countries like Afghanistan seem to be more active and forthright in their participation in the activities of the Blogosphere. Blog, as we know is a portmanteau of the term Web log. Encyclopaedia Britannica defines it as "online journal where an individual, group, or corporation presents a record of activities, thoughts, or beliefs." Oxford Online dictionary considers it to be "a personal website or web page on which an individual records opinions, links to other sites, etc. on a regular basis." However none of the definitions manage to cover the wide range of features that we find in the more advanced blogs of the recent times. Blogging is dynamic and flexible, but at its core, blogging is a "communications tool that encompasses all communication models: one-to-one, one-to-many, many-to-one, and many-to-many" (Banks xx). Many Muslim women from the Middle East and Indian subcontinent seem to be well versed with the techniques and advantages of blogging and have successfully used this medium to express their opinions and views on their own lives and on the world around them. Blogging has emerged as a perfect means for these women to be more visible and it enabled them to break their silence on their lives, conditions, disappointments and desires. The narratives that emerge out of the posts in such blogs are attempts in transgressing the boundaries with which the lives of Muslim women have for long been circumscribed.

Another very important feature of this rapid growth of blogging among Muslim women is the tendency to adopt a pseudonym or to write anonymously. The lack of identity does not pose any serious threat to the legitimacy of such blogs as content of the blogs often carry the weight of seriousness and truthfulness. On the one hand, freedom of expression is relatively higher in the virtual space as body is present only as an absence in that space and on the other hand, such space offers more security through the chance of concealing or obscuring one's age, gender , nationality, race, and the blogger's personal take on social, political and cultural issues. Even though the reasons and factors contributing to the emergence of anonymous and pseudonymous bloggers vary widely and cannot be strait-jacketed into one simple formula, concern for one's security remains the single most important impetus behind this phenomenon. In this regard, anonymous and pseudonymous blogging remains quite similar to the great spate of anonymous and pseudonymous texts which have enriched the literary world. John Mullan in his *Anonymity: A Secret History of English Literature* has provided detailed socio-historical account of the origin and success of such literary texts and has identified the widely different reasons behind the phenomenon. He has included mischief, modesty, and confession among some of the important reasons but has attached more importance to the personal danger that had often threatened authors of books with sensitive content. The story of the anonymous and pseudonymous voices in the blogosphere is similar to the one brought into focus by Mullan. There are innumerable instances of bloggers being punished for their activities in the blogosphere by the authoritarian regimes. Egyptian blogger Kareem Amer was charged with insulting the Egyptian president Hosni Mubarak and an Islamic institution through his blog. After a brief, almost farcical, trial session the blogger was found guilty and sentenced to prison terms of three years for insulting Islam and kindling sedition, and one year for insulting Mubarak. In Myanmar, Nay Phone Latt, a blogger, was sentenced to 20 years in jail for

posting a cartoon critical of head of state. In countries like China or Iran the situation is even more difficult for individual bloggers as the state keeps sharp vigil on the activities in the Blogosphere. A democratic country like India is also not lagging far behind as the arrest of two girls posting against the bandh during the funeral of Bal Thackeray in Maharastra has shown. So, it is not surprising that Muslim women have largely chosen to remain under the shadow of anonymity or pseudonymiry in their activities in the *Weblogistan*. (Yes, *Weblogistan* is a indeed synonym of Blogosphere frequently used by the bloggers from Indian subcontinent and the Middle East)

Muslim women's choice of *Weblogistan* as a forum or platform to bring into focus issues close to their lives and the reaction of the state, authoritarian as well as democratic, ranging from concern and suspicion to strict vigilance, against these activities in the Blogosphere can easily be related. The emergence of Blogosphere as the new public sphere, on the one hand, is the source of these women's faith in its effectiveness in underscoring their concerns and on the other is the primary reason of the alarm detected among the authoritarian powers. To understand the efficacy of Blogosphere as the New Public Sphere one has to go back to Jurgen Habermas, the German sociologist and philosopher, accepted by most as one of the world's leading intellectuals.

The Idea of Public Sphere

Without going into the intricacies of theories we can say that public spheres are the social institutions which allow for open and rational debate between people in order to form public opinion. Modes of such debates include face to face conversations, trafficking of opinions through speeches and exchange of letters and other written form of communication. Journals, newspapers, electronic media as a platform engendering views and opinions are also parts of the public spheres. In an ideal condition public sphere is open to all and citizens should try to reach an agreement not through exercise of force but through proper, rational dialogue and arguments. In his book *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Jurgen Habermas explores the cultural shifts and new developments in 18th century Europe which according to him paved the way for the development of public sphere. According to him, this 18th century public sphere came into being with the maturation of capitalism in Europe. Being an essentially bourgeois public sphere, it left working class and aristocracy largely excluded. As the bourgeoisie became powerful and influential enough to take away the control of the economy from the state it started, not very surprisingly, to assert their views and opinions in government policy in order to oversee the polity along with the economy. Thus, public sphere from its inception functioned as some sort of an intermediary between the public realm of the state and the private interests of individual members of the bourgeoisie. Habermas has foregrounded the existence of public sphere in this in-between-domain of private and public authority:

> The bourgeois public sphere may be conceived above all as the sphere of private people coming together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor.[27]

But, the public sphere, especially its bourgeois prototype gradually lost its importance in the course of the 20th century. The functions of welfare state, according to Habermas, made significant

contribution towards this decline of public sphere because there was sharp rise in the intrusion of the state into private affairs and the penetration of the society into the state. The very emergence of public sphere depended on a distinct separation between the private sphere and the public power and the mutual interpenetration of these two areas paved the way for the weakening of the intermediary which is the bourgeois public sphere. Habermas has further argued that in the late capitalism, both the bourgeois and the working class become privatised and this change in the subjectivity of these classes undercuts the possibility and centrality of debate. In such a condition subjective preference, and not rational discussion, dictated the action of a modern consumer of culture and a participant in electoral politics. The disintegration of the public sphere is visible in the growth of centralized communications media that eventually took control of the public sphere.

Emergence of the New Public Sphere: The World of Blogs

But, the emergence of Blogosphere in the last decade seems to have changed the scenario because it has started to play many functions of the public sphere. Blogosphere is a free, easily used and accessible venue for public discussion. As it is alive with debate, dialogue and journalism similar to those practiced before the absolute dominance by commercial forces and state machinery, it appears to be an important step in reclaiming the public sphere. To figure out the ways in which the activities in the Blogosphere can be related to the climate of debates and topical orientations of the public sphere, we must once again go back to Jurgen Habermas. Habermas, after taking into account the difference in size, composition of the public and the style of their proceeding, identifies three "institutional criteria" of bourgeois public sphere which can conveniently be applied to the modern day public sphere that we see in the form of Blogosphere. Firstly, Habermas has argued that public spheres "preserved a kind of social intercourse that, far from presupposing the equality of status, disregarded status altogether. The tendency replaced the celebration of rank with a tact befitting equals"(36). Blogs agree well with this idea because status (professional, social or economic) does not make much of a difference at least in terms of accessibility to Blogosphere. Of course reputation is as important as it is elsewhere but that cannot carry a blog too far. It has regularly been witnessed that there have been more followers of a blog coming from an unknown girl from some provincial town in a remote country than those supported by a celebrity. Secondly, before the public sphere came to exist, "the domain of "common concerns" which was the object of public critical attention remained a preserve in which church and state authorities had the monopoly of interpretation". The advent of public sphere enabled people to determine the meanings of the cultural products on their own because, "discussion within such a public presupposed the problematization of areas that until then had not been questioned." (Habermas 36). However discourse in the late 20th century became much more centralized dictated often by state through the commercial venues or from figures constructed from and by the news media. The Blogs swim against this tide and make an attempt, though unconscious, to free discussion and debate from the centralized control of commerce, media or state and to bring it back under popular control. Another very interesting aspect of this independent nature of blogosphere is that it tries to reverse the process of foregrounding topics of debates. Before the emergence of blogs, items for debates and discussions were always "brought *to* the

public rather than arising *from* the people" (Barlow 4). But blogs seem to have altered that trend as stories arising through popular interest are proving to be widely-followed topics of debates and discussions. Thirdly, Habermas refers to "the same process that converted culture into a commodity (and in this fashion constituted it as a culture that could become an object of discussion to begin with) established the public as in principle inclusive... The issues discussed became "general" not merely in their significance but also in their accessibility: everyone had to be able to be participate" (37). In the present time when culture has become a commodity and that commodity itself has transformed into a medium of unrestrained public discussion of culture, it is impossible to curtail the freedom enjoyed by blogs. As the commodity/culture gets decentralized, people become active participant rather than being passive observers. Debates and discussion in this new platform of Blogosphere can no more be confined within a privileged few. Therefore, one might say that, in spite of certain limitations, the blogs have managed to reestablish the public sphere much in the way that the salons, *Tischgesellschaften*, coffeehouses, letters, broadsheets, literary fictions and pamphlets initiated it in Europe three centuries ago. In such a sphere, we listen to the voices of the high and the mighty but can also hear the pseudonymous voices of Riverbend, a female blogger from Iraq or of Gul Makai, the school-student from the Swat valley of Pakistan or of Ellize, the Iranian blogger who collected blogposts by Iranian women on sexual issues.

Voices from the Weblogistan

To understand this drift among Muslim women towards revealing their true selves and lives in the virtual world of blogs, we may take into account some of the more popular blogs, Riverbend is one of the most famous of the blogs that has originated in and reflects the ambience of censorship, war, religiosity and patriarchy of the Middle East. It is written by a twenty-six year-old woman from Baghdad, the capital of Iraq. She is a former engineer who lost her job after the 2003 U.S.-led invasion of Iraq. Riverbend's blog has given the world a peep into what seasoned journalists could never give us: uncensored and unbiased picture of the life in Iraq. This blog was launched on August 17, 2003 and her last entry was in October, 2007. As the number of followers of her posts swelled rapidly, the weblog entries were later collected and published as *Baghdad Burning* and *Baghdad Burning II*. These two books have since been translated and published in numerous countries and languages and have remained favourite with readers from all parts of the world. The reason of this great popularity of this Muslim woman's blog lies in its truthful and unsentimental portrayal of the horror that was Iraq, the loss of innocence and youth that have crippled generations of Iraqis and the plight of women in a war-torn country. In January 2005 post, she brings into focus the debate over revoking the Personal Status Law and the great influence and pressure that was being inflicted by political parties on the daily lives of women. In her blog she narrates a discussion she had about the *hijab* with a friend, and she seems to be worried with the situation when the lack of freedom for women tends to reach such a proportion that her wardrobe would be dictated by others. She also relates occasional self-censorship by women revealed in their subconscious re-dressing or in the rubber bands worn around their ponytails to avoid attracting the attention of the growing number of Islamists:

> There's an almost constant pressure in Baghdad from these parties for women to cover up what little they have showing. There's a pressure in many colleges for the segregation of males and females. There are the threats, and the printed and verbal warnings, and sometimes we hear of attacks or insults.
>
> You feel it all around you. It begins slowly and almost insidiously. You stop wearing slacks or jeans or skirts that show any leg because you don't want to be stopped in the street and lectured by someone who doesn't approve. You stop wearing short sleeves and start preferring wider shirts with a collar that will cover up some of you neck. You stop letting your hair flow because you don't want to attract attention to it. On the days when you forget to pull it back into a ponytail, you want to kick yourself and you rummage around in your handbag trying to find a hair band... hell, a rubber band to pull back your hair and make sure you attract less attention from *them*. (Friday, February 18, 2005)

There are many such observations which offer new insight into the rapid Islamization of Baghdad and illuminate the broader discourse on the issue of veiling and freedom of Muslim women. These are the moments when Riberbend makes use of the new public sphere, the Weblogistan, to unveil the truth regarding the fate of women in war-ravaged Iraq.

Riverbend's voice sounds very similar to that of Malala Yousafzai, a school student from the town of Mingora in Swat District of Pakistan who wrote the blog *Diary of a Pakistani School Girl* in BBC under the pseudonym Gul Makai (the corn flower).In her posts she has given an account of the hell that is Taliban-ruled Swat valley and the sad plight of the school-going girls in that hell. Her posts had drawn the attention of the world to the remote land of the Swat valley and have invited the wrath of the local Taliban militants. After the militants tried to assassinate her she was shifted to England for treatment of her near-fatal injuries. Rest of her life-story is known to us all: her survival, her autobiography and her being awarded the Nobel Peace prize. It all started with those posts in which she passionately narrated the way girls were being deprived of their school-education by the militants. Her voice had an urgency that made the tragedy of the girls from the Swat valley who had to conceal their school dresses and were constantly threatened by the militants so palpable:

> My mother made me breakfast and I went off to school. I was afraid going to school because the Taleban had issued an edict banning all girls from attending schools .. . On my way from school to home I heard a man saying 'I will kill you'. I hastened my pace and after a while I looked back if the man was still coming behind me.
>
> ("I am Afraid" Saturday, January 3,2009)

Here, we must also take into consideration the voices of Iranian women in the world of blog. Notwithstanding the climate of surveillance combined with tacit and overt threats, these women have chosen to write about their lives with all their minor achievements and major disappointments. Iranian society for quite some time did not have anything that might function as a public forum for women where they can get opportunity to express themselves. In such situation writing has been a way of making themselves publicly visible. But not everybody can be a writer with some literary talent. However, with the emergence of weblog writing or Hogging, women's writing in Iran has gained considerable momentum. Ordinary young Iranian women of the urban middle class for the first time have found a suitable and relatively uncomplicated medium to express themselves. Iranian blogosphere is now populated by innumerable women bloggers who, through bold narration in their blogs, have unveiled the hidden women. The desire of most Iranian women bloggers is the same: to become visible and to find their voices which would reflect their agonies and ecstasies. This desire to be visible

has often reached the threshold of transgression of conservative religio-cultural norms as can be traced in the content of some of these blogs: "*Dokhtar boodan* (Being a [virgin] girl) and *Hamaghooshi-haye yek zan* (A woman's loving) are the weblogs of young women who write about their erotic and sexual experiences in personal but subtle and non-pornographic terms" (Amir-Ebrahimi 103). In April 2008 some women bloggers began to write candidly about their own bodies and physical needs and their relations with their sexual partners. The subject quickly drew the attention of others who blogged about it from various angles and responded positively or negatively. Some of the women bloggers were ruthlessly attacked, but many took up their defense.

Pseudonyms as Virtual Veils in the New Public Sphere

An appraisal of these voices of Muslim women in the virtual world of Weblogistan iterates the process of an unveiling which is important in foregrounding the generally segregated and rarely-cared-for existence of these people. However, this phenomenon of unveiling in the world of Blogosphere hinges on certain contradictions. In order to talk about their innermost desires and dreams, about the shattering of such dreams they need the shield of a pseudonym. All these women bloggers whom we have discussed use pseudonyms to express their views and opinions, to unveil their lives in the new public sphere. They are pretty sceptical about the physical-world consequences of their blogging and, as has already been discussed, physical security remains a crucial concern. These pseudonyms can therefore on the one hand be compared with virtual veils which enable these women to unveil the reality of their lives in a new public sphere which itself on the other hand is not real. The complex and contradictory connotations with which this entire process of unveiling in the new public sphere is burdened certainly adds a postmodern dimension to it. The fact that Blogosphere in this avatar of new public sphere shares many features of a Heterotopic space may provide us a direction in unravelling the contradictions within this phenomenon. In the last section of his lecture given in March 1967 that was the basis of the essay "Of Other Spaces", Michel Foucault points at those places "which are something like counter-sites" and in which "all the other real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested, and inverted." These spaces provide "a sort of simultaneously mythic and real contestation of the space in which we live" (Foucault 24). In the same essay he has commented briefly upon the two functions of heterotopic space:

> This function unfolds between two extreme poles. Either their role is to create a space of illusion that exposes every real space, all the sites inside of which human life is partitioned, as still more illusory (perhaps that is the role that was played by those famous brothels of which we are now deprived). Or else, on the contrary, their role is to create a space that is other, another real space, as perfect, as meticulous, as well arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled. (27)

The Blogosphere, in comparison to the "messy, ill constructed and jumbled" world in which the Muslim women bloggers like Riverbend, Gul Makai or Ellize from Iran reside is "meticulous" and "well arranged". The moment Gul Makai removing the veil of her pseudonym comes out of that perfect space, she becomes object of an attempted assassination. Only as a heterotopic space, this new public sphere can accommodate the strange but beautiful contradictions embedded in the phenomenon of unveiling in the virtual world of the Blogosphere with the help of a virtual veil which is nothing but the pseudonym used by the bloggers.

REFFERENCES

Amir E. M. "Transgression in Narration: The Lives of Iranian Women in Cyberspace." *Journal of Middle East Women's Studies* 4.3 (2008): 89-118. *JSTOR*. Web. 30 Nov. 2012

Banks, M. A. *Blogging Heroes*. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. Print.

Barlow, A. *Blogging America: New Public Sphere*. Westport: Praeger Publishers, 2008. Print.

Bulbeck, C. *Re-orienting Western Feminisms: Women's Diversity in a Postcolonial World*. Cambridge: Cambridge U P, 1998.Print.

Cooke, M. *Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Literature*. New York: Routledge, 2001. Print.

De Souza, E. *Purdah: An Anthology*. New Delhi: Oxford UP, 2004. Print.

Foucault, M. "Of Other Spaces." Trans. Jay Miskowiec. *Diacritics* 16.1(1986):22-27. *JSTOR*. Web. 14 Jan. 2012.

Habermas, J. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Trans. Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. Print

Heath, J. Ed. *The veil: Women Writers on Its History, Lore, and Politics*. Berkele and Los Angeles: University of California Press, 2008. Print.

Jain, J., and Amin A. Introduction. *Margins of Erasure: Purdah in the Subcontinental Novel in English*. Ed. Jasbir Jain and Amina Amin. New Delhi: Sterling Publishers, 1995. vii-xiv. Print.

Jain, J."Erasing the Margins: Questioning Putdah"*Margins of Erasure: Purdah in the Subcontinental Novel in English*. Ed. Jasbir Jain and Amina Amin. New Delhi: Sterling Publishers, 1995.1-11. Print.

Lateef, S. *Muslim Women in India, Political and Private Realities: 1890s -1980s*. New Delhi: Kali for Women, 1990. Print.

Mernissi, F. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Trans. M. J. Lakeland, Oxford: Basil Blackwell, 1991. Print

Mullan, J. *Anonymity: A Secret History of English Literature*. Princeton: Princeton University Press, 2007. Print

ONLINE SOURCES

Baghdad Burning. http://riverbendblog.blogspot.in/2005_Q2_01_archive.html

Retrieved on 20.11.2014

Diary of a Pakistani School Girl, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7834402.stm

Retrieved on 19.11.2014

Blog. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/869Q92/blog

Retrieved on 19.11.2014

THE LOGIC OF ETHICS IN THE *SHADOW* INDUSTRY: LITERARY PRODUCT AND LITERARY OBJECT IN THREE PETER CAREY STORIES

Arka Chattopadhyay*

The utilitarian view of literature is useful in the case of journalism, history, philosophy, but it doesn't seem a productive way for this novelist to think.

-Peter Carey (Gaile, 03)

Peter Carey and the Possibilities of a Literary Ethics

In conversation with Andreas Gaile in 2004, Peter Carey critiques the "utilitarian view of literature" and shows a keen awareness of discursive differences distinguishing literature from journalism, history and philosophy. And yet Carey often uses the objectivity embedded in forms such as journalistic reportage. In his short stories, the report is a preferred form of narration and we will see how he uses the cold objectivity of a veridical account to sharpen his ironic style. Peter Carey's work is reflexive about its own literary status. In this interview, he allocates a historical function to the literary work but for him this function forces history with literature and is irreducible to history as such. Carey suggests that his work involves a literary textualization of history. He shows concern for the "politics of the present" but also sees a continuity between this present and a history of its threads in the past: "the present always has its feet in the past." (Gaile, 03) In the context of Australian history, he is interested in the colonial mythology of lies where the past is either denied or concocted. In his corpus, the literary text is invested with the ethical task of reopening the past through its ruses in the present. And it gives a revisionist dimension to history by permitting multiple supplementary versions of the same historical event which had previously been locked away in a monolithic certitude of closed historical interpretation. Carey's work in his own words is a reaction to the alienating logic of late-capitalism:

> We are alienated from each other, from ourselves, work, from our environment. We are denied access to information and given misinformation instead. We are raised within an authoritarian system and teach our children to look for leaders. [...] I don't think people are mindless or stupid and no matter how fucked around we are by the values of late capitalism, I still think there is some residual human decency in most of us. (Gaile, 121)

It is in this locus of "residual human decency" that Carey seems to locate the operation of literature. Literature is given a task of disclosure here. Its work is deemed to be a preservation of the precious little remainder which can resist the capitalist process of alienation. This residue is inalienable and hence resistant to the process of alienation. To take the crucial word from the finale of *My Life as a Fake* (2003), Carey's literature has an ethical function in disclosing 'sparagmos' or the

* Doctoral Candidate, Writing and Society, University of Western Sydney, Sydney, Australia

dismembered body of truth. As he claims, his work wishes to unravel the "logic of business" prevalent in today's late-capitalist economy. If Carey is aware of increasing commercialization of literature, what does he do in his work to subvert this complicity? I would argue that Peter Carey is acutely aware of the status of literature as a saleable product in the contemporary global market. In fact he is fascinated with the fact that literature is a product. Not only does he textualize this fascination with literary production but also translates it into an ethical act of acknowledgment. Moreover, there is great subtlety in the way he aestheticizes this admission by appropriating the economic logic within the aesthetic process of creation. This can be seen as a flipping of the capitalist logic in which the literary appropriates the economic logic of production and not the other way round.

In the story 'Conversations with Unicorns', the writer of the report ends up killing a unicorn in his attempt io tell the animals how human beings kill them merely for economic profit. The unicorns think that only God is capable of the gift of death and they believe when God kills a unicorn, man arrives in the scene, only to take care of the corpse. They are not aware of human weapons, guns and so on. The narrator who is also the writer of this 'report' must show them the operation of the gun and this demonstration results in the death of Moorav, one of the unicorns. Moorav's death; at the hands of a human being is believed to be a curse which would take back the boon of death, resulting in a world of dreadful deathlessness. This explanation comes from the priest of the unicorn-community and this is where the rational objectivity of the report meets the fabulation of the fairy tale. Religion as a mass-mythology of the community problematizes the ethical task of truth-telling. The narrator again loads his rifle at the ambiguous closing point of this story-cum-report. 'Conversations with Unicorns' shows the problematic nature of the literary ethic which simply tries its hand at unfolding the capitalist conspiracy. The emancipatory ethical task of informing the unicorns about the economic evils of man backfires completely and by the end of the story, it becomes impossible to distinguish between the positions of this ethical informant and a poacher. Carey's report is thus a stark testimony to the dangerous reversibility of ethical communication, collapsing into capitalist violence. We will now see three different and yet consistent movements in three Peter Carey stories where a literary ethic of revelatory communication manifests itself in a problematic as well as problematizing manner.

'American Dreams': Art that became Business but only for a while

'American Dreams' analeptically tells the story of the enigmatic Gleason's Walls which eventually yield an extraordinary model township when they are knocked down after the death of the eccentric master builder. The self-exiled artist erects gigantic walls on Bald Hill and employs a host of Chinese workers to help him construct the enigmatic artwork as people think he has gone stark mad. The Walls become a prohibited zone and trigger endless speculation in the dwellers of Bald Hill. Something mysterious continues to take shape within them and when they are finally knocked down after Gleason dies; the town is astonished to find a model township inside, which exactly resembles Bald Hill. But the model is too perfect for comfort. It not only captures the exterior of the real town's life but also its secret inner life including its transgressions and obscenities. Its impeccable verisimilitude makes it unsettling. The model town is invested with Gleason's prophetic visions and when the narrator, himself one of

the town-dwellers, lifts the roof from Cavanagh's model house, he finds the representation of Mrs. Cavanagh in bed with young Craigie Evans. This is how the model town reveals unsettling secrets buried deep within the surface of its real counterpart. Carey sees literary mimesis as a disturbing exposition of buried truths. There are heated debates in the town regarding the intention and the magical achievement of Gleason's model township. If we see Gleason's town as an artwork, which it is, its ability to look into the secrets of town life can be regarded as its truth-telling function. However, it is exactly at the level of this function that Carey locates the threat of economic appropriation. The ethic of aesthetic truth telling is also the USP of this installation art. The magical revelatory dimension of Gleason's town is a crowd puller. This quality of disclosure makes the artwork open to commercialization. US Dollars keep pouring in and the model town alongside the real town becomes a popular tourist attraction. The grand American Dreams of the small town dwellers are finally realized through Gleason's Walls.

The model is sanitized for the tourists and the representations of Mrs. Cavanagh and Craigie Evans are removed. The American tourists keep requesting the inhabitants of the real town to imitate what their models do in Gleason's artwork. The model town becomes primary and the real town merely plays second fiddle to it. In Carey's ironic mimesis, bordering on simulation, the copy becomes the original and the original is left with no other choice but to sustain itself as a copy of the copy. The tourists are given a map to tally the real and the model towns. They come and request the narrator's father to stare at the gears of Dyer's bicycle, just the way his replica does in Gleason's town. In this way the dwellers of the real town are objectified by the gaze of the market. However, the tourists are disappointed by the fact that time has passed and the little boy in Gleason's town is no more a little boy in reality. They continue to demand the boy's presence but it remains impossible. All time is unredeemable and the little boy has now grown into the narrator of the story. The tourists cannot believe it is the same person. Gleason's town is locked in time and with the passage of time, it becomes increasingly difficult to create identificatory bridges between the model and the real town. As time passes, many of the figures in the model die in the real world and no parallel can ever be established thereafter.

There is a subtle critique of photographic realism in 'American Dreams'. If the exactitude of representation is the USP of Gleason's model town, pulling in the crowds and money, it is this very exactitude that will turn people off with the passage of time. Reality is dynamic and fast changing while the model work of art captures a historical moment in the development of reality. The desire dictated by market economy strives to make neatest identifications between reality and its representation. The economic gaze judges the representation solely on the basis of its imitative faithfulness towards the original but this craze for exact identification can never stand the test of time. It is here that a work of art achieves an autonomy which resists market economy. Carey cleverly decides to tell the story in an analeptic mode which only highlights the passage of time. He ends the story on a note of ironic disappointment as the tourists stand irritated by the fact that the boy in the model has become a man in the real town: "They spend their time being disappointed and I spend my time feeling guilty, that I have somehow let them down by growing older and sadder."

'American Dreams' does not simply show the commercial appropriation of art but also the point of slippage where the market gets frustrated with the growing autonomy of an artwork when its parallels with the real world start to vanish. Demand for absolute realistic verisimilitude in art is seen as a capitalist demand and the stagnatory nature of Gleason's model township can be seen as a resistance against the objectifying capitalist gaze. There are two interlocking notions of history here. One is a history of stasis demanding absolute correspondence between the past and the present which is only possible within a time of eternity. This is the commoditized history unmasked by Carey's story. On the other hand, there is a history of flux where the present can only be defined through its differences from the past. The artwork (which is not a literary text here but more generally an aesthetic object) captures and immobilizes the motion of history at a given point in the past but the irreversible chronology of time ensures a forward movement where the temporal process of change and mortality takes a different course in history. I argue that this present gives an archival value to the past in which we can see literature's real historical function of documenting what is lost in the present. This archival function of literature points to a loss from the past to the present by marking at as a residue. Carey's critique of capitalist demand is grounded in the way he differentiates these two histories from one another and forces the stasis of the one with the inevitability of dynamism in the other. The capitalist demand is a demand to keep things the same while the real history as Carey suggests, is all about breaking that identity with difference. Gleason's Walls stand as a dissident marker of difference between the past and the present.

'The Puzzling Nature of Blue': The Aesthetic Return of the Repressed Commodity

Vincent, the vagabond Irish poet and the "great Economics man" (Carey, 158) in the story 'The Puzzling Nature of Blue' says: "As a businessman, I was a poet, but as a poet, I was a fucking whore." (148) The female narrator's comment foregrounds the literary appropriation of the commercial process: "He [Vincent] is eager that business be seen as a creative act" (148). Seeing business as a creative act remains an ambivalent stance in Carey's stories. If it is declarative of literature's status as a commodity, it is also a site of appropriative resistance. In a board meeting of Farrow International, the American company, it was Vincent who had decided to warehouse the drug Eupholon, banned by the Australian government, on Upward Island. This banned drug haunts the capitalist system as an economic vestige as Eupholon causes the Gilbert and Sullivan revolution on Upward Island. The reports mention "the blue hands of certain members of the revolution" (152) which is a result of Eupholon's extended use. The stealing of Eupholon leads to the appointment of armed guards who indulge in random killing at the warehouse. This is what triggers the revolt and by the end of the story, the blue hands caused by Eupholon are turned into a heroic coda of revolution. Solly tells Vincent:

> All the best men got blue hands. All the bravest men. We're bloody proud of these hands. You got blue hands on Upward, Vincent, you got respect [...] We had to beat that damn guard to get these hands, Vincent. When the time came to kick out Farrow, everyone knows who's got the guts to do it, because we're the only ones that got the hands. (159)

Peter Carey transforms the economic product into a mythology of revolution and resistance where the color blue reveals its 'puzzling' duality. Eupholon which is a direct product of capitalist economy is turned on its head into a resistant trace of what Carey had called "residual human decency." At the fag-end of the story, there is a further aestheticization of the blue as Vincent's Eupholon-affected blue penis becomes subject to the female narrator's oral sex. In a meeting of erotic and revolutionary instincts, the blue of Eupholon becomes a radiant aesthetic symbol. The blue organ is qualified with the adjective "beautiful" in the text and it is this beautification which completes the process of literary appropriation:

> And there I will see his beautiful blue penis thrusting its aquamarine head upwards towards me. It will be silky, the most curious silkiness imaginable. (165)

By now Vincent has fought his revenge with Van Dogen, the armed guard on Upward Island. All questions of love-hate which the narrator had about him dissolve in the near surreal autonomy of the colour blue. Nothing remains except for a "shimmering searing electric blue" (165). The blue therefore emerges as a trace of the repressed market material which re-turns as an emancipatory and aesthetic phenomenon in the story. This logic of return is not unlike the psychoanalytic logic of repression where the more it is repressed in the past, the more powerfully it returns in the future. The banned drug returns like the repressed and what is rejected in the capitalist system of production returns in the form of an aesthetic object. The aesthetics of the color feeds into a culture of protest by stirring a revolution which in its turn gives birth to a legend, a story— another literary opening. As the Gilbert and Sullivan revolution on Upward Island becomes a historical icon of resistance, the Eupholon goes down to the posterity as a symbolic object signifying the erotics of resistance as well as the mythical epicenter of a transgressive fable. In Carey's story, the rejected commodity stages a return as a subversive aesthetic object. In this history of differential repetition, the repression and the subsequent return of the repressed market phenomenon open up a historical sequence in which aestheticization of commodity becomes a weapon for uprising and change.

'Report on the Shadow Industry': An Ethic of the Shadow

'Report on the Shadow Industry', like 'Conversations with Unicorns' pastiches the journalistic style of reportage. The genre of report is undercut by the withdrawal of specific details and the story reads like a parable that works almost exclusively as an allegory. The story is about the strange shadow industries that spring up around the west coast of America. The shadow factories have huge chimneys which emanate smoke with many colors. The smoke is rumored to contain dangerous shadows which are too powerful to be packaged. These factories sell neatly packaged shadow boxes. The shadow boxes offer a site to the unknown and perhaps that which should never be known. There are abstract and colorful designs on them and statistics reveals that the "average householder spends 25 per cent of his income on these expensive goods and that this percentage increases as the income decreases" (138). All kinds of speculations float in the air about the impact of the shadow boxes and in the generic tradition of the report, Carey's text lists these various received interpretations one by one. While statistical research shows a direct correspondence between shadow sales and suicide rates, some claim

that shadows have always been there with human beings and "packaged shadow is necessary for mental health in an advanced technological society" (138). Many consider the shadows to be mirrors of the souls. According to this view, the shadow is subjective and only reflects the beauty or the despair, embedded in the beholder's gaze. Much like 'American Dreams', 'Report on the Shadow Industry' suggests yet again, a connection between merchandizing and representational identification.

From the note of a friend's (named S.) letter, narrated in the cold remoteness engendered by the report form, the story moves into a personal realm as the writer buys her old mother a box of shadows, knowing her weakness for them. They do not do any good and we can read this in her facial expressions when she encounters them. The writer's ex flame describes this expression as "that awful despair that comes when one has failed to grasp the shadow." (139) In the fifth and penultimate section of the story, we come to know that the writer's father had abandoned his family because of something mysterious he had seen in his box of shadows. He had left an enigmatic note declaring his incapability to express what he had seen in the shadow box. The contents of the box were incommunicable and they remained so over the years. The crucial point in the story is its fifth and final section, which is also its briefest one. The story ends on the chilly note of confession where it acknowledges itself as nothing other than a shadow:

> My own feelings about the shadows are ambivalent, to say the least. For here I have manufactured one more: elusive, unsatisfactory, hinting at greater beauties and more profound mysteries that exist somewhere before the beginning and somewhere after the end (139).

This self-reflexive resolution which gives the story the status of being a product of the shadow industry highlights art's commercialization. As we have seen above, the acknowledgment of literature's status as a commodity for Carey is not unrelated to a configuration of literary ethics. The emancipatory aspect of the story is not restricted to the way it exposes the economic complicity of literature. It does more than that by aestheticizing the shadow and underscoring its polyvalence. Carey uses the word "beauty" to refer to his text which admits itself to be a shadow. And at the same time, he also uses the word 'manufacture' with its unmistakable commercial associations. If the shadow is an aesthetic object, it is also a market product. The enigmatic beauty of the literary shadow lies in its 'ambivalence', in its openness to an infinite range of interpretations. The ambivalent nature of the literary object subverts its linear market logic as a product. The lure of the shadow boxes lies in their unknowable and inexpressible character. The market taps into the consumer's absolute desire to know the unknowable and express the inexpressible. The note left behind by the writer's father is a case in point.

The capitalist market economy produces a paranoid desire to know everything, even the unknowable. The shadows mark the impossible limit of that paranoid desire for knowledge. This activates a dialectical break between knowledge and truth. If the shadow as a market product incites the capitalist desire to know everything, the shadow as the enigmatic aesthetic object holds onto a truthful break in knowledge where everything can never be known. This double status of the literary shadow marks Carey's subtle stance of resistance. The radically unknowable nature of the literary shadow indicates that a truth can come into being only as a break in knowledge or a non-knowledge. It is important to note that Carey's story does not force this unknowable point. He does not impose

any specific symbolic meaning on the shadows. The story only emphasizes their potential polyvalence. The literary ethic of Carey's story lies in the collapse of the paranoid if not totalitarian knowledge system by preserving the unknowable. If the shadow boxes entice you to know the unknowable, the function of the literary text as shadow is to hold on to that unknowable point and renounce all desires to know the unknowable. The literary ethic is not seen as an imparting of knowledge but as a subtraction of knowledge which makes the residual truth resonate with the echoes of subtraction.

Literary Ethics and Truth-telling: Knowledge and the Impossible

In *Ethics: An Essay on the Understanding of Evil* (2001), the French philosopher of the event, Alain Badiou outlines an ethical theory of truths where he talks about 'the unnameable' and its 'forcing' as one of the paradigms of evil in today's world. He writes: "Every absolutization of the power of a truth organizes an Evil" (Badiou, 85). According to Badiou, truths are processed through a collapse of the existing regime of knowledge. For him, there are four fundamental truth processes: art, love, science and politics but each of these processes can be divided further into endless manifestations. There are incalculable events in each of these realms which take place against the dominant order of these worlds and these events bring about what he calls the 'truth process.' Badiou's truths are composed of a pure multiplicity and each of these multiples are multiples of other multiples and the process of division can go on ad infinitum. When it comes to the subjective naming of a truth, the language of a particular situation cannot possibly name all the elements of its truth. Badiou observes:

> At least one real element must exist, one multiple existing in the situation, which remains inaccessible to truthful nominations [...] At least one point that the truth cannot force. I shall call this element the unnameable of a truth (85-86)

In Badiou, forcing this unnameable point of a truth is to invite 'disaster' and 'disaster' is one of the three figures of the Evil (the other two being 'simulacrum' and 'betrayal') in his ethical framework. In 'Art's Imperative: Speaking the Unspeakable', a lecture delivered in 2006, Badiou defines the artistic imperative as a labour to continue not only when it is possible but also when it is impossible to continue. While artistic desire is a desire to speak the unspeakable, it must also be careful when it comes to drawing a line and not forcing the unnameable of a truth. In his vision, all art thrives on this paradoxical ethic: if *something is impossible to say or write, even that impossibility has to be inscribed as an artistic form in itself.* Following Badiou's imperative to its limit, if the impossible as a limit becomes an aesthetic form in itself, it will be able to resist the capitalist dream of mastery which consists of making all knowledge possible. The power of the impossible to punctuate the encyclopedia of knowledge with the emergence of an enigmatic truth gives birth to a restrained affirmationism in art. This art is affirmationist without being totalitarian. What prevents it from becoming totalitarian is precisely this power of the impossible as a limit which must be inscribed. The inscription of the impossible draws a limit and ensures that the unnameable point of a truth is not forced. Moreover, this liminal installation of the impossible in writing makes it possible or at least writable in a certain way.

To sum up, let's construct a sequential narrative of the Peter Carey stories we have examined. 'American Dreams' records the economic and commercial appropriation of art and hints at resistance

through a changing matrix of time. In 'The Puzzling Nature of Blue', Carey takes a step forward not only by showing art's commercial appropriation but also by counter-appropriating the economic and the commercial through the aesthetic. 'Report on the Shadow Industry' extends the aestheticization of the commercial function of art and introduces a logic of ambivalence that holds on to the unnameable. The shadow industry which manufactures the shadow boxes tempts the human subjects to force the unnameable into knowledge. This is the totalitarian face of the Evil and it has a strong Badiouean resonance in the story. There is a differential point between two kinds of shadow in Carey's report. There is a world of shadows inside the text and the text itself which contains the shadow world is another shadow. If the shadow boxes spark off several speculative interpretations in the capitalist demand to know everything, the literary text tames that logic of 'all' with an alternative logic of the 'not-all' by underscoring the status of literary truth, not as knowledge but as non-knowledge. The story as a polyvalent shadow declares the impossibility of fixing any specific meaning to itself. This is where it creates an ethical distance from the totalitarian epistemology of market economy.

The ethical task of literature here is not simply to provide knowledge of the capitalist mechanism but also to mark the edge of that knowledge so that the knowledge does not get coopted with it. For Carey, to punctuate a knowledge that threatens to become a weapon at the hands of capitalist economy is the real ethical function of literature as critique. And as we have seen, this is not an ethic which adds on to knowledge but instead subtracts from knowledge till we reach a residual space where a vestige of inalienable value can be located against the tidal waves of capitalist alienation. Carey's ethic strikes a note of resistance by remaining faithful to the double status of the aesthetic phenomenon as both a commodity and an object which is impossible to commoditize. Be it Gleason's Walls or the blue of Eupholon or the shadow report of the shadow industry, Carey's stories avow the commoditization of art only to turn it into a site of resistance where the commodity is transformed into a more opaque aesthetic object. And this object shifts the emphasis on the impossible, the unknowable and a constantly changeable value. This aestheticization of the "logic of business" forms a history of its own in the stories. Carey's literary ethic engages with history as a dynamic process which can bring in change and force sameness with difference through the sudden appearance of an event producing a truth as a rupture in knowledge. The literary object stands in fidelity to this truth which is less of a product and more of a process maintaining openness to its own future.

FURTHER READINGS

List of Winks Cilcd and Consulted;

Badiou, A. 2001. *Ethics: An Essay on the Understanding of Evil*. Trans. Peter Hallward, London and New York: Verso.

Logics of Worlds: Being and Event 2. Trans. Alberto Toscano (London and New York: Continuum, 2009).

"Art's Imperative: Speaking the Unspeakable", audio files of a talk delivered at The Lacanian Ink Event, The Drawing Centre, New York, March 8, 2006. http://www.lacan.com/symptom.7_articles/iosefina.html (Accessed 18 September, 2014).

Carey, P. 1995. *Collected Stories*, London: Faber.

My Life As A Fake (London: Faber, 2003).

Gaile A. (ed) 2005. *Fabulating Beauty*: Perspectives on the Fiction of Peter Carey, Amsterdam and New York: Rodopi.

Snodgrass M. E. 2010. *Peter Carey: A Literary Companion*, North Carolina: McFarland.

Woodcock, B. 2003. *Contemporary World Writers: Peter Carey*, Manchester and New York: Manchester University Press.

ইলেকট্রা মাই লাভ

সুরঞ্জন রায়*

গ্রীক পুরাকাহিনির ইলেকট্রাকে অবলম্বন করে মহৎ নাটক লিখেছেন অনেকেই। ভারতবর্ষ যখন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামির করুণাঘন সুরে আপ্লুত হয়ে আছে ঠিক তখনই গ্রীসের মহান নাট্যকার সফোক্লিস ও ইয়ুরিপিডিস দুজনেই পুরাকাহিনির ইলেকট্রাকে নিয়ে দুটো নাটক লেখেন। আধুনিক যুগে ইংরেজী সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক ইউজিন ওনীল লেখেন 'মর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' এবং বুদ্ধদেব বসু বাংলায় লিখলেন 'কলকাতার ইলেকট্রা'। রঙ্গমঞ্চ এবং সিনেমাতেও এর ছায়াপাত ঘটতে দেরি হল না। কৌশিক সেনের 'স্বপ্নসন্ধানী' বাংলায় মঞ্চে নিয়ে এলেন ইলেকট্রাকে আর হাঙ্গেরির বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিকলোস ইয়াংসো (১৯২১-২০১৪) ১৯৭৫ সালে ছবি করলেন 'ইলেকট্রা মাই লাভ'।

১৯৫৮ সালে 'দ্য বেলস হ্যাভ গন টু রোম' ছবির মধ্যে দিয়ে ইয়াংসোর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও বিশেষ পদক্ষেপ দেখা দিল ১৯৭১ সালে তোলা 'রেড সালম' ছবি থেকেই। আমরা জেনেছি ভাব ও রূপের দ্বন্দ্বই শিল্পের আত্মপ্রকাশের প্রধানতম উৎস। ইয়াংসো-র ছবিতে রূপ ও ভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে হাঙ্গেরীর অবস্থান অনেকটাই স্বতন্ত্র। যার ফলে এখানে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানের সাধক যেমন জন্মগ্রহণ করেছেন তেমনি আবির্ভাব ঘটেছে সিনেমার তাত্ত্বিক নেতন্সা বেলা বালাজ আর মার্কসীয় তাত্ত্বিক জর্জ লুকাচের মতো বেশকিছু দার্শনিকেরও। ইয়াংসো-র সিনেমায় তাই দার্শনিক প্রতীতি আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে রূপসাগরে ডুব দিয়েই। দীর্ঘ দীর্ঘ শটে সিনেমার শরীরকে সাজিয়ে দর্শকের সামনে মেলে ধরার প্রবণতা দেখা দিল 'রেড সালম' ছবি থেকেই। ১৯৭২ সালে এই ছবিটির সুবাদেই কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ইয়াংসো শ্রেষ্ঠ পরিচালকের শিরোপাটি জিতে নিলেন। সত্তর মিনিটের সিনেমা 'ইলেকট্রা মাই লাভ' গড়ে তুলতে তিনি ব্যবহার করলেন মাত্র ১২ টি শট। তাঁর ক্যামেরা-মুভমেন্ট বাঁধা পড়ল নাচের ছন্দে। শহরের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা মাঠ-ময়দান থেকে কোনো এক ময়দানকে লোকেশান হিসেবে বেছে নিয়ে মধ্যরাতে যথাযথ আলোক সম্পাতের সাহায্যে নিরাবরণ কুশীলবদের নিয়ে চলত তাঁর শ্যুটিং। পরদিন সকালেই সেই নেগেটিভ রাজধানী বুদাপেস্টে পাঠিয়ে প্রিন্ট করে নিয়ে আসা হত— অপছন্দের জায়গা থাকলে রিশ্যুট করে নেওয়া হত। চিত্র-প্রতিমা নির্মাণে পরিচালকের এতটাই দক্ষতা ছিল যে নিরাবরণ কুশীলবদের কোনো যৌন উত্তেজনার আবহ তৈরি করার সুযোগ না-দিয়ে, তাতে অবগাহন না-করে যেন এক আদিম সমাজের অবয়বের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাদের মুখোমুখি। তাই ছবিতে নীতিহীন সমাজে মাৎসন্যায়ের পরিবেশকে সরিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক নির্মল ও মুক্ত আবহের 'সিভিল সোসাইটি'।

ছবির শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, একটা লং শট— বিস্তীর্ণ ময়দানে আবছা আলো-অন্ধকারে ছুটে চলেছে মুক্তিপিপাসু একদল ঘোড়া। টপ শটে ধরা পড়ে, ইলেকট্রা লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইলেকট্রাকে দেখতে দেখতে আমাদের মনে পড়ে যায় সুধীন্দ্র নাথ দত্তর বিখ্যাত কয়েকটি পংক্তি—

প্রাক-পুরাণিক বাল্য বন্ধু যত
বিগত সবাই, আমি অসহায় একা...

আমরা জানতে পারি নুরাকাহিনির ইলেকট্রার মতোই সে পিতৃহীন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটা চেহারা ধীরে ধীরে আমাদের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। পনের বছর আগে মা ক্লাইটেমেনস্ট্রার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাবা অ্যাগামেমননকে হত্যা করে তার বন্ধু অ্যাইজেস্তাস বিয়ে করে ক্লাইটেমেনস্ট্রাকে এবং দখল করে নেয় সিংহাসন। ভাই অরেস্টেস পালিয়ে যায়। বিপ্লবের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে ইলেকট্রা সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরে বেড়ায়। বোন তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে— বিয়ে করে ঘরকন্না করতে বলে, ইলেকট্রা কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অনড় অটল। তার ধারণা অরেস্টেস একদিন ফিরে আসবেই, তখন ভাই-বোন দুজনে মিলে প্রতিশোধ নেবে— নিশ্চিহ্ন করে দেবে অত্যাচারী রাজাকে। অ্যাইজেস্তাস তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে তাকে বোঝায়, সে যেন সকলের সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়, তাহলে সে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। আমাদের সামনে উড়তে থাকে

*বিশিষ্ট লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক

হাঙ্গেরীর ইতিহাসের পাতা— ১৯৫৬ সালের ২৩ শে অক্টোবর রাশিয়ার দমন নীতির বিরুদ্ধে হাঙ্গেরিয়ানদের অকুণ্ঠ সমর্থনে ছাত্র-শ্রমিকদের দ্বারা দু সপ্তাহের যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার পতনে হাঙ্গেরীতে নেমে আসে এক ব্যাপক কালো রাত্রি— এতে পাঁচ থেকে ছয় হাজার হাঙ্গেরিয়ান নিহত হয়, আহত হয় তের হাজার মানুষ, ধ্বংস হয় কুড়ি হাজার ঘর-বাড়ি। এ ছাড়াও দু লক্ষ মানুষ পালিয়ে যায় পশ্চিমে। এর স্মৃতি তো সহজে মানুষের মন থেকে মুছে যেতে পারে না! ছবিতে দেখি অরেস্টেস একদিন ফিরে এসেছে। ইলেকট্রা ভাবে ভাই বোধহয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধের কথা ভুলে গেছে। অরেস্টেসের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাতে না-পেরে ইলেকট্রা তাকে হত্যা করে। কিন্তু বিপ্লবকে তো হত্যা করা যায় না, তাই অরেস্টেস বেঁচে ওঠে, বোনের সঙ্গে অত্যাচারী রাজাকে সরানোর কাজ শুরু করে। একটা মিড-লং শটে ধরা পড়ে অ্যাইজেস্তাস একটা গোলাকার বলের ওপর আসীন হওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা বুঝতে পারি ম্যাকবেথের মতো এই রাজাও সময়ের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছে, যা হবার নয়! রাজার বিরুদ্ধে জনগণও লড়াইয়ে সামিল হয়। আমাদের হীরক রাজার মতোই— (অন্তরীক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়) দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। এক সময় রাজাকে সবাই মিলে ধ্বংস করে।

ছবির উপান্তে এসে আমরা দেখতে পাই, বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিতে এসে উপস্থিত হয়েছে একটি লাল রঙের হেলিকপ্টার। ইলেকট্রা-অরেস্টাস প্রস্তুত হয়। হেলিকপ্টারে চড়ে বসার জন্যে। আমাদের মনে পড়ে যায় বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভার কথা। আপন রাজ্যে বিপ্লবের লাল পতাকা উড়লেও তিনি সেখানে স্থিতু হতে পারেননি— বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন দেশে-দেশান্তরে।

THE MUCHALINDA-BUDDHA: ITS ORIGIN AND EVOLUTION IN THE ART OF INDIAN ASIA

Shreyashi Chaudhuri*

The art of Indian Asia abounds with divinities and genii superior to humans. While the myths of emanation and dissolution revolve with cold and ruthless detachment to the world of human joy and despair, the popular legends teem with tutelage deities who incessantly lure, encircle, encourage and comfort sentient beings spellbound within the dream-web of delusion (*maya*). These guardians of life—the demigods of the waters (*nagas*), the spirits of the earth (*yakshas*) and the patronesses of the vegetal life (*vrikshadevatas*)— bestow upon the children of the world all the boons of earthly comforts—abundance of crop and cattle, offspring and long life. The *naga*, identical in both essence and detail in Hindu, Jain and Buddhist art, is the serpent, or the spirit embodying its life force, which is not any ordinary snake but the king cobra (*Naja naja*) personifying the terrestrial waters and functioning as the keeper of the life-energy stored in springs, wells and ponds (Zimmer, 1946). According to James Fergusson (1809), the serpent motif is depicted in this art in three iconographic styles: the primitive theriomorphic or reptilian body with a mono or polycephalous hood (Fig. 1); the advanced anthropomorphic or human body with a serpent crest over the head (Fig. 2); and the stylised therio-anthropomorphic or hybrid body of a human torso coupled to a serpent tail (Fig. 3-4). The mammoth bas-relief portraying the Descent of the Ganges (ca. seventh century CE), a sublime epitome of the Pallava art, in Mamallapuram, southern India, depicts each of the three classes (Fig. 5). In the ageless serpent lore (Vogel, 1972), the *naga* inhabits the dark netherworld, dwells in resplendent palaces at the bottom of rivers, lakes and seas, and guards the treasures of corals, shells and pearls. The Pali fables recount the serpent kings (*nagarajas*) as the celebrated *genius loci* of forests, villages and cities who were either benevolent seraphs such as Elapatra and Muchalinda, or malevolent demons subdued by Buddha himself such as Apala and Kalika. Tradition also has it that the great adept (*mahasiddha*) Nagarjuna (Arjuna of the Nagas) was handed down the esoteric ideas of the universal void (*sunyata*) by the *nagaraja* custodians of Buddha's teachings in its fullness. Heinrich Zimmer (1955) ascribes three roles to the *naga* motif in the Buddhist art: in general, at the shrine portals, it is the door keeper (*dvarapala*) attending Buddha with pious devotion (*bhakt*); in the aniconic art, where the Blessed One is never seen in his human form, it signifies the invisible presence of the Master who was the human vehicle of the absolute; and in the iconic art, where the human figure of the Enlightened One is enthroned as the transcendent vessel of the supreme, it is the celestial support of this singular, imperishable, cosmic substance, the force underlying all the beings of the universe.

The Legend of Muchalinda the Serpent King

The Udana (Sutta Pitaka) and the Mahavagga (Vinaya Pitaka) of the Pali Canon, and the Lalitavistara of the Sanskrit Canon, contain the lore of Muchalinda Nagaraja, the giant serpent king who dwelled

* Lecturer, Department of History, Calcutta Girls' College, Kolkata

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1: *Naga* in the reptilian form with one-headed hood, Mamallapuram.
Fig. 2: *Naga* in the human form with five-headed serpent crest, Mamallapuram.
Fig. 3: *Naga* in the hybrid form with three-headed serpent crest, Mamallapuram.
Fig. 4: *Naga* in the hybrid form with seven-headed serpent crest, Mamallapuram.
Fig. 5: The Descent of the Ganges, central section of the open air bas-relief depicting *nagas* and *nagis*, Mamallapuram.

among the roots of the muchalinda tree (*Barringtonia acutangula*) in the grove of Uruvela, near Bodh Gaya (Zimmer, 1946). It is said that during the sixth week subsequent to Shakyamuni's self-illumination (*sambuddhi*) under the tree of enlightenment (*bodhivriksha*), he was deeply absorbed in a state of exalted serenity beneath the tree of the serpent king when the heavens darkened and a prodigious downpour descended for seven days. Then, the Titan emerged from his cavernous realm, wrapped the Enlightened One seven-times with his mighty coils and sheltered him under a parasol-like canopy of his enormous hood to protect from the hostile elements the one who is the source of all protection. When the great thunderstorm ceased, the joyous serpent king assumed the shape of a youthful prince, paid obeisance to the Master, circumvented him thrice and retreated into his subterranean abode. While the Book of Genesis puts the blame of the fall of Man on the Serpent as the embodiment of evil; in the Buddhist belief the world was saved through the righteous act of a pious cobra as one of the prime embodiments of life.

The Muchalinda-Buddha Motif through the Ages

In the folklore and art of the East, there is no antagonism between the naga and Buddha, which contrast with the archetypical symbolism of the Serpent and the Saviour in the West. In the Buddhist belief, Tathagata became the incarnate redeemer of all the creatures of the earth, the heavens and the underworlds, and the serpent, as the principal personification of the waters of terrestrial life, is no exception. One particular variety of the Buddha images— the Muchalinda-Buddha i.e. Buddha

sheltered by Muchalinda Nagaraja (Sharma, 2014)— emphasizes upon this supreme harmony between the Saviour, who has triumphed over all the bondages of nature to reach the utmost stillness of the absolutely extinction (*nirvana*), and the Serpent, who embodies that very bondage through incessant cycles of birth, suffering, death and rebirth (*samsara*). This paper presents a brief overview of this key motif from its emergence and initial phase of development in India to its subsequent diffusion to Southeast Asia where it progressed to produce some of the finest masterpieces of Buddhist art.

The Muchalinda-Buddhas of India: the Seeding of the Idea

The Muchalinda-Buddha, in comparison with the other types Buddha images, is relatively rare in Indian art. However, the earliest representation of this motif, in its aniconic form, can be traced back to the Sunga period, in the art of Bharhut (ca. second century BCE), central India. Here, a medallion of the railing (*vedika*), bearing the votive epigraph: *Muchilindo Nagaraja* (Muchalinda, King of the Serpents), recounts the fable (Fig. 6). The Bharhut sculptures in general represent the emergence of the visual narrative in India (Dehejia, 1997). The monoscenic method of story-telling, a static narrative mode, was used here (and later time and again) on account of the simplicity of the story line. In this aniconic relief, Muchalinda appearing in his reptilian form occupies the greater part of the medallion. Under the bodhi tree, the colossal serpent envelopes with its convoluted tail an empty throne seat (*bhadrasana*) with a pair of footprints before it (indicating Sakyamuni), and shelters this under its enormous umbrella-like hood of five equal heads. The throne and umbrella signify royalty, a metaphor for the spiritual supremacy of Buddha. A remarkably similar relief image on a pillar (*stambha*) is also known from the art of Pauni (ca. second century BCE), western India (Fig. 7). During the same period, at Sanchi (ca. first century BCE), also in central India, the theme is illustrated in a couple of similar panels on the southern and western gateways (*toranas*). These aniconic reliefs depict an empty throne (without the footprints) under the bodhi tree, as the indexical sign of the Blessed One. However, the serpent king along with his entourage of four consorts (*nagis*) appear in the human shape. This is the earliest and a rare anthropomorphic delineation of the serpent king. The *nagaraja* displays a five-hooded serpent crest while the *nagis* have only one hood each. Muchalinda, the dominating figure, is seen reclining in the posture of royal ease (*rajalilasana*) while holding a lotus stalk (*bisa*) with his right hand, something reminiscent of the later icons of the enlightened being (*bodhisattva*) Padmapani (Lotus Holder) who holds a similar stalk is in his left hand. Next, during the Satavahana period, in the art of Andhra i.e. Amaravati and Nagarjunakonda (ca. second-third century CE), southern India, the friezes of the cope and drum slabs swarm with Muchalinda-Buddhas, the most diverse and abundant in India. The early Amaravati sculptures are continuations of the aniconic tradition. Muchalinda is portrayed in both the reptilian and the rare hybrid forms. Buddha is indicated by his pair of footprints, however on a full-blown lotus or serpent coils. Finally, the earliest iconic imagery of this theme appears in the late Amaravati and Nagarjunakonda sculptures. While these images persist with the theriomorphic serpent, but, Buddha, for the first time, is represented in the anthropomorphic form (Fig. 8). These early icons represent not only the advent of this advanced genre, but they are also the oldest prototypes of all the ensuing Muchalinda-Buddha images in India and well as on other distant shores. In all these sculptures

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 6: Muchalinda-Buddha, pillar medallion, Bharhut stupa.
Fig. 7: Muchalinda-Buddha, pillar panel, Pauni stupa.
Fig. 8: Muchalinda-Buddha, drum slab frieze, Amaravati stupa.

Buddha is depicted in the seated cross-legged thunderbolt posture (*vajrasana*) on an elevated serpent seat (*nagasana*) formed by three- to five serpent coils. The serpent, rather than coiling (thus awkwardly and inauspiciously covering) the body of the meditative saviour, as in the legend, forms a throne analogous to the lotus seat (*padmasana*). While the tree is conspicuously absent, the cobra's elaborate five- to seven-headed hood (equivalent to the lotus nimbus) forms an impressive halo (*prabhamandala*) behind the head of Buddha as the mark of a great being (*mahapurisha lakshana*). Other such iconographic traits appearing in these Buddha images include the protuberance-like hair knot (*ushnisha*) surmounting the curly haired head to symbolize his flame of enlightenment, the half open eyes with downward gaze to signify his absorption in meditation, the circular third eye (*urna*) embossed on the forehead to suggest his vision of the heavenly worlds, the long ear lobes to represent his renunciation of worldly attachments and the slight smile on his lips to embody the essence of his compassion. He performs the gesture of meditation (*dhyanamudra*)— that of the celestial Buddha, Amitabha (Infinite Light)— by placing both the hands on the lap with the palms facing upward, symbolizing the accomplishment of spiritual perfection; or the gesture of fearlessness (*abhayamudra*)– that of the celestial Buddha, Amoghasiddhi (Unfailing Accomplishment)— by raising the right hand to the shoulder height with the palm turned outward and fingers upward, signifying the absence of fear of rebirth. His body is wrapped with a diaphanous knee-length robe, the right shoulder usually

uncovered, with fluid rhythm of lines in its folds. At times, additional figures of *nagas* and *nagis* in their human shape with typical crests surround or flank the Blessed One, worshipping him in with the familiar gesture of adoration (*anjalimudra*), by pressing the palms of the folded hands together with the fingers pointing upward to show reverence. During the Kushan period, at Gandhara (ca. first-third century CE), modern Afghanistan and Pakistan, a rare Muchalinda-Buddha sculpture depicts the serpent actually entwine the body of the Master, a literal rendition of the fable, something usual for this school of art. During the Gupta period, at Ajanta (ca. second-sixth century CE), western India, a couple of Muchalinda-Buddhas appear as wall sculptures in the Caves VI and VII. A similar image is also known in the art of Pitalkora (ca. third-fourth century CE), from the same region, as a rare painted mural. During the post-Gupta period, the last depictions of this motif in India can be seen in the Pala art (ca. eighth-twelfth century CE), at Nalanda, eastern India. These sculptures in general represent the receding of the classical narrative tradition in India (Dehejia, 1997). Steles depicting the eight great miracles (*astamahapratiharya*) of Buddha's life scenes have the central image of Buddha under the *pipala* tree (*Ficus religiosa*) performing the gesture of touching the earth (*bhumisparshamudra*)— that of the celestial Buddha, Aksobhya (Unshakable One)— by lowering the right hand and extending the fingers to touch the ground, witnessing the transition from Buddha-to-be to Buddha. In some of these sculptures, the Muchalinda-Buddha is present, albeit as tiny vignettes, as the central figure of the three small human figures on the pedestal. The Muchalinda-Buddha icons of the Gupta and post-Gupta periods display fine details of Buddha's visage, hair and robe. Furthermore, this popular Buddhist theme has parallels in the myth and art of Parshvanatha, the twenty-third victor (*tirthankara*) of Jainism, both denoting that the forces of nature respect the saviour, protect him, and worship him, before he reveals himself as the universal teacher of humans and beasts, gods and demons. The earliest images of the latter were produced by the Mathura school of art (ca. third century CE), northern India. According to Heinrich Zimmer (1955), these Indian icons, both portraying the Serpent winding about the body of the Saviour and spreading its hood over his head, bear strong resemblance with the basic pattern of the cult symbol of a human figure entwined by serpents called Aion from ancient Mesopotamian (ca. 2000 BCE) and the Near East (ca. first century CE).

The Muchalinda-Buddhas of Southeast Asia: the Blossoming of the Idea

In contrast with the Indian mainland, the Muchalinda-Buddha figures conspicuously in the art of Southeast Asia, mostly as free-standing stone (sometimes bronze) images, occasionally of gigantic proportions, as an independent object of worship. Beyond India's shoreline, this motif features in the art of Sri Lanka (Ceylon), Myanmar (Burma), Thailand (Siam) and Cambodia (Kampuchea). These icons must have been, directly or indirectly, modelled on the prototypes from the art of Andhra: the meditating Buddha seated on the throne-like coils of a giant snake being sheltered under the expanded parasol-like unequal-numbered cobra hood. With further variations and innovations in the iconographic details, some of these Muchalinda-Buddhas, particularly those of the Khmers, not only represent the high point of this particular motif, but also rank among the paramount masterpieces of Buddhist art. The earliest Muchalinda-Buddhas outside the Indian mainland are known from Sri

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 9: Muchalinda-Buddha, Anuradhapura period, Srilanka.
Fig. 10-11: Muchalinda-Buddha, Dvaravati period, Thailand.
Fig. 12: Muchalinda-Buddha, pre-Angkor period, Cambodia.

Lanka, where they were produced during the Anuradhapura period (ca. seventh-eighth century CE). These are strongly evocative of the Andhra art. The serpent coils vary from one to three, and the hood is characteristically nine-headed with the central one, for the first time, slightly larger than the lateral ones (Fig. 9). These are closely matched by the images from Thailand, particularly the Dvaravati period (ca. seventh-tenth century CE). These exhibit an admixture of both the archaic features of the Andhra art and the advanced traits of the Pala art. The seat has one or three naga coils (rarely completely absent) and the parasol consists of three or seven heads. This is coupled with ingenuous innovations: Buddha flanked by a pair of tapering votive reliquary mounds (*stupas*) symbolizing the *bodhisattvas*; the elegant lotus bud finale of his *ushnisha*; presence of minute *stupa*-bearers on the pedestal; and the cranial protuberances and simian features of the serpent heads with the central one clearly larger than the others (Fig. 10). At times, the *naga* necks are distinctly separate or the hood is markedly triangular (resembling a *pipala* leaf). Rarely, Buddha performs the gesture of discussion (*vitarkamudra*), by joining the tips of the thumb and the index together, and keeping the other fingers straight to symbolize spiritual discourse, or even the *bhumisparshamudra* (Fig. 11). In Myanmar, mostly from the Bagan period (ca. eleventh-fifteenth century CE), the motif infrequently appears on the small and exquisitely carved steles which are miniature renderings of the Pala ones. The seven stations of the enlightenment (including the Muchalinda-Buddha legend) are inserted between the central image (of the enlightenment) and the remaining seven life scenes. In Cambodia, Buddha images reappeared during the Khmer period (ca. tenth-thirteenth century CE), and interestingly most of them represent the Muchalinda-Buddha— the dominant icon of Buddha in this region. Like in

India and other parts of Asia, the serpent symbolism among the Khmer people predates their adoption of Buddhism (and earlier Hinduism) as the official religion. The *naga*-Buddha imagery may have struck a chord with their ancient indigenous beliefs, motivating its adoption as the supreme deity of Vajrayana or Tantric Buddhism of the Khmers. The archaic Muchalinda-Buddhas (ca. tenth century CE) of the Khmer art show a strong link with the Dvaravati art (Fig. 12). Later, with the gradual absorption of indigenous and Hindu influences, these icons further developed into the standard Khmer images of Muchalinda-Buddha (ca. twelfth century CE), particularly in the temples of Angkor Wat and Bayon. This is the ultimate Khmer reinvention of the motif inspired by the classical style of Hindu sculptural vocabulary (Fig. 13-15). The sophisticated iconography codified three *naga* coils and the seven-headed hood with several innovative advancements. The three thick and scaly serpent coils have an ascending width, taking the interesting shape of an inverted pyramid. The seven-headed hood gradually became oval with the smaller lateral heads turned upward towards the massive middle one. The serpent necks display disc (*chakra*) or lotus (*padma*) motifs. The crests on the serpent heads disappeared. Similarly, the Buddha image, unlike the conventional plain habit of a monk (*bhiksha*), is bare-chested, crowned and heavily adorned with bejewelled regalia, like the Hindu gods, consisting of at least a crown (surmount by a conical tiered chignon-cover), a diadem and earrings. Sometimes, they display a small object on the right palm or objects such as water flasks, relic caskets or lotus buds on the lap. The knees tend to be larger than the uppermost serpent coil, thus accentuating the inverted pyramidal shape - an evocation of Mount Meru to emphasize the cosmic nature of Buddha. Indigenous ancestor worship of the Khmers also seems to have become incorporated into their Vajrayana fold. The huge icons of the great temples, decked with full or partial regalia, are royal portrait statues which are considered as the apotheosis or divine form (*vrahrupa*) of the king whose features are depicted on the Buddha's face (Fig. 13-14). The king is identifiable here as a Buddharaja of the god-king (*devaraja*) cult. Consequently, these Khmer sovereigns, with their royal headdress and ornaments, were immortalized with the attitudes and features of Buddha sheltered by the Titan. The smaller images of private chapels, depicting the central Muchalinda-Buddha flanked by two four-armed deities— Lokeshvara (Lord of the World) on the right and Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) on the left– is the Khmer Mahayanic triad (Fig. 15). These are the apotheosis of commoners and their parents. These figures display a degree of classical perfection that remains unparalleled. They eloquently convey the Buddhist ideals of blissful absorption into the inner experience of enlightenment, extinction, and liberation from bondage. In the words of Heinrich Zimmer (1955), they display a flawless, peacefully detached spirituality blended masterfully with a dreamy, graceful voluptuousness of a subtle, unearthly, sensual charm. The self-absorbed countenance emits a radiance that is gentle, empathetic and celestial. The supreme calmness of the release through absolute extinction pervades the very substance of these images.

Conclusion

Indian art opens a fascinating window into the timeless realm of the Indian spirit with poignant images of the essence of India's message for humanity (Zimmer, 1955). Indian art is fed and fostered upon by a rich storehouse of myths and symbols (Chandra, 1996). The ancient Buddhist monuments

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 13-14: Muchalinda-Buddha, Angkor period, Cambodia.
Fig. 15: Khmer Mahayana triad of Muchalinda-Buddha flaked by Lokeshvara (right) and Prajnaparamita (left), Angkor period, Cambodia.

teem with the bold depiction of myriad nature spirits of pre-Buddhist origin. Stella Kramrisch (1983) notes that here plants, animals and humans appear to be organically connected to the mother earth who suckles them with life and nourishment. The protracted trail of the Muchalinda-Buddha motif across Asia through the centuries makes an intriguing and fascinating study. Perhaps, an ancient fecundity symbol from West Asia, or even a prehistoric totem of indigenous fertility cults, was assimilated and adopted into the Buddhist literature and art to propagate its fundamental principles to form the germ of an idea that was further developed and transmitted across South Asia, ultimately reaching Southeast Asia where it accomplished its final maturity with the absorption of both indigenous and exotic elements. The Muchalinda-Buddha images are a perfect reconciliation of antagonistic principles. The Serpent, symbolizing the life forces motivating birth and rebirth, and the Saviour, vanquisher of the lust for life, severer of the bonds of birth, leader of the transcendent path, are in a harmonious union. Furthermore, their Cambodian avatars exemplify the plasticity of natural metaphors as receptacles always ready to accept and hold the essence of new meanings, and lending themselves to the service of the most divergent functions. They encompass the seemingly audacious belief that both princes and commoners were living gods, incarnations of the infinite, divine essence, something fundamentally consistent with the doctrines of Mahayana Buddhism (and parallel teachings in Hinduism) that all of us - although unaware of the supreme truth and ignorant of the transcendental essence of our being - are fundamentally Buddhas, capable of the supreme enlightenment and the blissful self-extinction. Heinrich Zimmer (1955) comments that the final

blossoming of this enduring motif represents a spectacular democratization of an obsolete Mesopotamian pattern— the very essence of the basic tenets of Mahayana: All things are Buddha-things.

ACKNOWLEDGEMENTS

The author is obliged to the Directors of the Indian Museum, Kolkata, the Government Museum, Chennai and the Municipal Museum, Allahabad, for their kind consent to access and photograph the artefacts in their archaeology galleries. I wish to convey my gratitude to the Director, National Library, Kolkata, and the Library-in-Charge, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, for all the facilities provided. I would also like to thank my husband, Dr. K.N. Chaudhuri, for his help in the preparation of the manuscript and the photographic plates.

REFERENCES

Chandra, R.G. 1996. Indian Symbolism: Symbols as Sources of Our Customs and Beliefs. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

Dehejia, V. 1997. Discourse in Early Buddhist Art, Visual Narratives of India. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

Fergusson, J. 1809. Tree and Serpent Worship. Reprint, 2004. Asian Educational Services, New Delhi.

Kramrisch, S. 1983. The Representation of Nature in Early Buddhist Sculpture (Bharhut-Sanchi). In: Miller, B.S. (Ed.) Exploring India's Sacred Art, pp. 123-129. Pennsylvania Press, Philadelphia.

Sharma, R. K. 2014. Naga in Indian Iconography and Art. Aryan Books International, New Delhi.

Vogel, J. P. H. 1972. Indian Serpent Lore. Reprint, 2004. Indological Book House, Varanasi.

Zimmer, H. 1946. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Reprint, 1999. Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

Zimmer, H. 1955. The Art of Indian Asia: Its Mythology and Transformations. Reprint, 2001. Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

CASTE AND THE LEFT: A BRIEF SKETCH OF THE CASTE QUESTION AND THREE DECADES OF LEFT FRONT RULE IN WEST BENGAL

Surajit Gupta*

In contemporary India, the institution of caste seems to be one of the major factors that influence day-to-day politics in multifarious ways. It has reconstituted itself and taken newer forms in the course of its interaction with modern politics. In fact, caste and modern politics in India are entwined in such a way that both mould consistently with each other in relation to power. But most importantly the trajectory of the pattern of changes in caste relations vis-a-vis contemporary politics has not been uniform in different parts of India. Its changing pattern is very distinct in different Indian states depending on their specific histories of development. The question of how West Bengal, especially rural West Bengal, differs from other Indian states in terms of caste is answered by the long-held political myth (even among academicians) that caste does not matter in West Bengal. Therefore, West Bengal is an appropriate field for the enquiry into this question, since the changes in village society in West Bengal have probably been more spectacular in the Indian context, particularly during the last three decades (1980-2010). During this period, according to Dwaipayan Bhattacharyya, 'rural West Bengal has been subjected to extensive governmental intervention in the form of land reforms and democratic decentralization. This [has] made West Bengal's rural political economy.. .distinctly different from the rest of the country'.

This difference from the rest of the country is so much so in the social and political aspects of the state that, he argues, 'political parties in rural West Bengal largely transcended caste, religion and ethnicity based organizations which have some relevance in other parts of the country'. This argument undoubtedly deserves attention when Sekhar Bandyopadhyay asserts that 'by making some adjustments in form, the caste system in Bengal has managed to sustain its essence and in that sense Bengal is no exception to the general pan-Indian pattern'. This paper explores, how caste matters in rural politics and to what extent the traditional caste system has been transformed under the impact of socio-economic and political reforms, undertaken particularly during the last three decades of uninterrupted left front rule. It also looks at the caste dynamics and caste politics of West Bengal, which has witnessed several significant changes in its countryside in the period under discussion, and reveals that caste relations and caste identity have overarching dimensions in the day-to-day politics of rural Bengal. The paper clearly divulges how caste adapts to the existing power structure, i.e., the political party and the panchayat in a rural setting, and maintains in essence the system of social hierarchy.

Notwithstanding all the success stories in land reforms during the last three decades of left rule, the scheduled castes, e.g., the *Bagdis*, in general possessed either no land or only meagre amounts of

* Assistant Professor, Department of History, Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya Radhanagar, Nangulpara, Hooghly

land. They had to work mainly as agricultural labourers in the farm lands owned by the upper castes of the villages, of them (69 per cent) were landless. The Scheduled Caste families owned an average 0.07 acre of land, whilst the amount was 1.5 acres for the landed upper caste families. These figures demonstrate that the Scheduled Caste people of villages were not only socially disadvantaged, but at the same time they represented the propertyless and economically backward sections of the rural people. The Scheduled Caste communities were so much identified with manual labour that the upper caste people called their hamlets 'labour para' where para meant small habitations, in Bengali parlance, based usually on castes in rural areas. Dayabati Roy has shown that in a Burdwan village while the proportion of the *Bagdis* (the only Scheduled Caste community in the village) was 42 per cent of the total population, they held only 20 per cent of the village agricultural land. Here 58 per cent of the Scheduled Caste families were landless and the remaining 42 per cent owned an average 0.2 acre .per family. It could also be seen from her household survey that 73 per cent of the Scheduled Caste households (and 95 per cent of the tribal households) in another village and 62 per cent Scheduled Caste households in this village, depended primarily on agricultural labours for their livelihood. The rest of the Scheduled Caste households depended either on cultivation, livestock-rearing or non-farm work. The Scheduled Caste cultivators were mainly share-croppers, or lessee cultivators, supplementing their income from the meagre amount of land they owned. The non-farm work on which the Scheduled Caste families depended was mostly agriculture-based, for instance, labouring in cold storage centres, and trading and transporting vegetables and other agricultural products. In the latter village a few Scheduled Caste families owned sizeable amounts of land (an average of two acres or more) and two families had government jobs. It is obvious from the above figures that the primary dependence of the Scheduled Caste people on agricultural labour stemmed from their situation of landlessness. Moreover, these people did not have much access to a non-farm means of livelihood, so were forced to depend on labouring on the lands of the higher and middle caste people. These share-croppers (many of whom remain unregistered even though the left front government in West Bengal claimed it had been successful in registering them) suffered substantial losses through having to pay one-third of their produce to the landowners. At a time when profits in agriculture took a downturn due to increasing costs in general, besides the normal risks involved in attaining high yields, this one-third share of the produce taken by the landowners had a negative impact on the earnings of the share-croppers with the result that they were hardly able to recuperate their labour costs or recover the cost of cultivation of certain crops. Nevertheless, they still had to pay the stipulated one-third share to the landowners, resulting in indebtedness. With the spread of market economy, implementation of land reform measures to a certain extent, and above all the increasing assertion of the subaltern people in the countryside, rural labourers have been largely successful in severing some forms of bondage sustained by the traditional caste system. Today the labourers of rural Bengal are apparently free to negotiate the sale of their labour in the labour market. But this freedom is severely constrained by different factors. Firstly, the socially backward rural people have very little access to non-farm work, which is scarce in rural areas and not readily available to them in urban areas. Secondly, these poorly paid rural people who seek jobs in urban areas are very often engaged in the most insecure and risky jobs in the informal sector. In villages located not far from the urban industrial areas, a number of

people had opted for jobs there. But their experiences had not been pleasant and many of them had to return to agricultural work, which seemed to them a more reliable means of livelihood. Such people were seen to be actively participating in the recent anti-land acquisition movement. Thirdly, an abundance of labourers in rural Bengal means they have to remain idle for long periods in a year. All these factors hamper the bargaining power of the labouring people and increase their dependence on the upper caste landowning community. In villages, these three factors were evident, though in different degrees, pointing to the fact that the caste-wise division of labour had been in the main persisting there. This appears contrary to the observation of M.N.Srinivas that the system of production based on caste-wise division of labour was 'fast breaking down' in rural India. Rather, the earlier observation of Srinivas that 'the lower castes are tenants, servants, landless labourers, debtors and clients of the higher castes' remained more relevant to the ground situation existing in rural Bengal. Though the strictures, based on Hindu *Dharmashastra*, on caste-wise division of labour have largely disappeared from the rural scene (except for rituals and ceremonies), the traditional pattern of division of labour based on caste hierarchy had in the main remained under economic compulsions. Furthermore, the dependence of rural labourers on the upper caste landed community for their mere survival seems to seriously hinder the attainment of autonomy in economic relations. Landownership has always remained a pillar of caste division in the society. The Anthropological Survey of India recorded similar observations in its study of 4,635 communities/castes under its 'People of India' project where it noted 'better control over land and other resources' as one of the characteristic features of higher castes in India.

Modern education, preferably in English language, cultural values, and a sense of social propriety, as well as landownership, have been the characteristic features of higher castes in Bengal since the middle of the nineteenth century. Since then, the upper castes of Bengali Hindu society, mainly

Brahmin, Baidya and Kayastha, in general called the *bhadralok* (the 'respectable people', the 'gentle people'), whilst the Scheduled Caste groups were predominantly involved in low-paid manual jobs and considered to be '*chhotolok*'. But it can be seen at present that a division of the society into *chhotoloks* and *bhadraloks*, based mainly on caste positions of different social groups, is prevalent in rural West Bengal. The terms *chhotolok* and *bhadralok* are now commonly used in Bengali parlance to mean people belonging to the lower castes and higher castes respectively. These terms are of course used by the educated higher caste people who regard themselves as *bhadralok*, or gentlemen, and others as *chhotoloks* in the derogatory sense. The term chhotolok is also used amongst higher castes to abuse somebody of their own caste. In the contemporary rural power structure, based on the practices of grassroots democracy and caste-wise reservations, the traditional social hierarchical order seems to be largely continuing in new forms. But these social and political aspects of caste assume different shapes in different villages depending on the specific conditions of the particular villages.

Caste, status and stratification

In several villages it has been observed that there are marked differences in the dwelling conditions, sanitation, water and electricity supply facilities between the upper classes and scheduled castes people. The Government has pumped major funding into primary school education through its literacy

campaign, but still progress in education seems abysmally low. In particular seasons, the children of Scheduled Caste families have to engage in cultivation works, apart from their day-to-day involvement in various domestic labours like cattle grazing. In a number of primary schools there is a stark disparity between the children of the upper castes and those from the Scheduled Caste background, distinct not only by their attire and appearance, but also by the pattern of their sitting in the classrooms. The upper caste children generally occupy the front seats and respond the most in class lessons. Most of the children from Scheduled Caste families fail to continue their studies beyond the primary level. Although some Scheduled castes get Government jobs but that did not change the status of these communities. Rather, the job-holder families became somewhat detached from the rest of their communities, by constructing concrete houses away from their caste habitats, and through their efforts to upgrade their status and be accepted into the bhadralok category. This phenomenon might be an instance of aspiration of upward mobility of some individual families belonging to the lower caste. In fact, 'social mobility was ultimately conceived in terms of acquiring greater degree of purity'. Here the lower caste people were aiming for a greater degree of ritual purity 'for socially validating the position of eminence earned by them'.

In this context, it would be worth to take a look at the concept of caste in Marxist ideology. Caste is seen by Marxists as an element of superstructure and so, neglected; as an appearance that can be discarded to get at the underlying class or national 'reality'; as a secondary (cultural) category that can be superimposed on an analysis after 'class' has been discussed; as a conspirational (hence, ideological, political, that is superstructural) weapon of capitalists, landlords and Kulaks, used to divide the working class. According to Gail Omvedt, this is inadequate, in fact erroneous. Omvedt says, caste existed not simply at the level of the cultural superstructure– not only in terms of 'ideas' of purity and pollution or 'rules' about intermarriage and interdining– but as part of the relations of productions themselves. And when feudalism was maintained in a transformed form under colonial rule, caste also was maintained at the level of 'economic' relations as well. Caste continually and inexorably inserts itself as a problem in organizing class struggle. For example, the experience of organizing agricultural labourers and those with some land or those who are mainly poor peasants of different castes. In such cases, it seems an overreaction to say that the reality itself is only a 'class' war- unless we deepen our understanding of class itself.

Arild Rudd linked economic well being to cultural change. Rudd's main question was why the local party leadership of the CPI(M), many of whom were caste-Hindu in the Bardhamaan district villages where he worked favoured certain groups of the poor-particular jatis from among the scheduled castes- and not others. Rudd further argued that the 'civilisational' objectives of the CPI(M)'s cultural project(anti-casteism, teetotalism and literacy) followed closely from earlier cultural and social-reform movements. Rudd described the operation of jati ideologies and how this structured the distribution of benefits from agricultural growth. The two Scheduled Caste jatis discussed were Muchi and Bagdi. Rudd argued that the Bagdis, former lathiyals, have benefitted more than the Muchis from economic reforms. Bagdis have also been favoured in the selection of party candidates. The party's 'civilisational' project has succeeded with Bagdis, who are more scrupulous in religious observances than Muchis. The Bagdis have become included in the sphere of power via their adoption of certain values. Once

Congress-supporting liquor-producers, they became teetotal CPM loyalists. They have achieved higher literacy levels than Muchis, indicating greater social belonging and status. The Muchi attempts to raise their social status have been widely ridiculed and scorned. Even the upper-class party leaders looked upon the scheduled caste panchayat members as 'faltus'. Party leaders shared the caste viewpoint that the Scheduled Caste-tribal people were unable to do mental or intellectual work such as running the panchayat, which had to be run practically by upper caste people.

This is reflected in the society as whole. Upper caste people are reluctant to visit Scheduled Caste-tribal hamlets and generally do not accept food in lower caste houses. Higher caste women never visit Scheduled Caste-tribal paras and avoid close contact with the lower castes and tribal people. Children of upper caste families mostly take midday meals in the village primary school, usually sitting separately from Scheduled Caste children. This is not an isolated observation in West Bengal, as is shown by the survey report of Pratichi (India) Trust. The friend-circles in the village were constituted largely on the basis of caste groups. Even though on the surface all seems well, there exists a strong undercurrent of caste feeling. Even a landless agricultural labourer belonging to a varna-Hindu caste, differentiates himself from the Scheduled Caste and tribal labourers he used to toil with.

Caste and politics

The rejuvenation of the panchayati raj system in 1978 enhanced the importance of the Scheduled Caste-tribal communities in village politics. Undoubtedly the Scheduled Caste-tribal population initially turned into a strong support base for the Communist Partyof India (Marxist) principally due to the support the party provided to these communities in their struggles against the landed gentry. This symbiotic relationship between the Communist Party of India (Marxist) and the Scheduled Caste-tribal people of the villages changed with the entrenchment of the party in state power, and its subsequent change in policy from struggle to reform. Thus the trajectory of the changing relationship between caste and power traversed a zigzag path after 1978. As the Communist Party of India (Marxist) shifted its focus from struggle to reform, the earlier relationship between the party and the Scheduled Caste-tribal communities of the village underwent important changes. While the tribal community tried to seek some other ally in the wake of their disenchantment with the ruling party, the Scheduled Caste communities seemed to embrace the new policies of the party, which was based mainly on benefit distribution through the panchayat. It seemed that the welfare politics of the state for the upliftment of the so-called backward sections resulted in competition among the lower castes and tribal people to garner more benefits for their respective communities.

Empowerment

The question of empowerment of the lower or *antyaj* castes through reservation of panchayat seats and posts, and mandatory inclusion of representatives of the socially deprived sections in various village level committees like the Village Education Committee and the Village Development Committee (Gram Unnayan Committee), may be examined in the background of these politics. The lower caste representatives may have assumed the coveted seat of the panchayat pradhan only to find himself to be a 'fish out of water' in the existing power structure essentially managed by the rural elite.

The Communist Party of India (Marxist) considered him to be a 'dummy' in the position of power rather than a real authority of the local panchayat. Indeed it arranged for upper caste persons who had been in charge of the panchayat earlier to carry on running it. Though reservation had at least been instrumental in instilling an aspiration for political power among the lower caste people, the real transfer of power to the backward section could not possibly be achieved without a further uprising of the Scheduled Caste people in the political sphere. Thus it appeared that in both the panchayat and the party, the two principal power centres in rural Bengal, the upper caste leadership was not set specifically to accept a person belonging to lower castes in the structure of power. The ideological overtone of caste seems to be reflected in the rural polity based on the division of *chhotoloks* and *bhadraloks*.

Conclusion

It can be summed up that, although in the economic field, caste almost ceases to operate based on structural principles of the caste system, the division of labour largely coincides with the caste division under economic compulsion and 'in ideological terms the categories of caste have continued to provide many of the basic signifying terms through which collective identities and social relations are still perceived'. Caste still seems to be a major dynamic reason in rural areas by which everyday politics revolves. The aspiration of upward mobility on the part of lower castes is also evident in the villages. It appears that institutional or formal decentralization of power could not eliminate caste-based hierarchy from the social and cultural body of society if not accompanied by the upward mobility of the backward communities and a social-political movement to fulfil the objective.

FURTHER READINGS

Bhattacharyya, D. 2009. Of Control and Factions: The Changing 'Party-society' in Rural West Bengal, Economic and Political Weekly, Vol. XLIV (9), 28 February.

Bandyopadhya, S. 2004. Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal, Sage Publications, New Delhi

Srinivas, M. N. 2003. An Obituary on Caste as a System, Economic and Political Weekly, 38 (5), 1 February

Singh, K. S. 1993. People of India: An introduction, Seagull, Calcutta,

Sanyal, H. l981. Social Mobility in Bengal, Papyrus, Calcutta,

Ruud, A. E. 2003. Poetics of Village Politics: The making of West Bengal Rural Communism, Oxford University Press, New Delhi.

Bhattacharya, H. 1998. Micro Foundations of Bengal Communism, Ajanta Books International, Delhi

Roy, D. 2012. Caste and power: An Ethnography in West Bengal, India, Modern Asian Studies 46,4, Cambridge University Press, Denmark

(COM) PROMISED COMPARISONS AND THE TRIALS OF TRUTH-TELLING

Anik Samanta*

The true and the approximately true are apprehended by the same faculty.
—Aristotle

'Now, sir, what is your text? [...]Where lies your text?' asks Olivia, in Shakespeare's *Twelfth Night*, of a Viola disguised as Cesario. What follows is a *tour de force* of textual malvolutions, and misprisions, all timely mended. What follows is also a peek into how selves are fashioned -gathered together - with(in) the fabric of signs, yet not quite.

The point of the 'text', and talk, is, of course, courtship. What is a text? A text is what an author produces. A text is what an actor cons. What is an author? An a(u)ctor... a name... a no... a function... of (f) a text. What is courtship? 'The timid sipping of two thirsty souls from a goblet which both can easily drain but neither replenish.' And talk? 'To commit an indiscretion without temptation, from an impulse without purpose.' According to Ambrose Bierce.

The courter, come with a (pre)text - another's text, already prepared - he has taken care to 'con' well, is all too soon thrown 'out of text' as the addressee, the 'cruellest she alive', a she apparently without compare, loses no time to shrug off the commonplaces of quasi-Petrarchan cant, and parries the shopworn superlatives with deadpan 'positives'. Woe betide the wooer who woos by the book, and professes by proxy! Complimentary superlatives draw caustic 'positives'. The comparative, in these parleys, is overleapt, perhaps because the (con) text admits of no (common) ground for comparison. Yet it is the very expressive 'medium' she eschews, the comparative, and thus comparison, that comes to meet her, once and again, at the crossroads of choice, and overwrites her superlative negation with a (barely concealed) invitation to 'negotiate'... her face... forthwith. All end well, all comparisons (comparare. literally, 'to match, pair') are well negotiated.

'Make no compare' between the loves of men and women, Orsino commands - or confesses to - Viola disguised as his page, who happens to compare better than the former in the scale of Olivia's affections. Comparisons, we see, constitute and constrain sexual (in) difference (and 'agency') through the course of the play. They also take on the complexion of rebarbative competition. Comparison as a modality of expression thus shows itself to be a modality of experience and existence as well - a way of knowing, feeling doing, - and being.

Comparisons are often banal - tiresome; they can be base too, and their consequences bitter. Although the common-place of composition, a comparison may be misplaced, misprised or merely mistimed, if only after the event. 'An instance', from *Henry IV*.

> **FALSTAFF** 'Sblood, you starveling, you eel-skin, you dried neat's tongue, you bull's pizzle, you stock-fish! O for breath to utter what is like thee! You tailor's yard, you sheath, you bowcase, you vile standing tuck —

* Assistant Professor in English, Shalboni Government College, Paschim Medinipore

PRINCE Well, breathe awhile, and then to it again, and when thou hast tir'd thyself in base comparisons, hear me speak in this.

The rejection of Falstaff may not be laid at the door of his rotten rhetoric, but did the allowed fool not compromise his career a little with his *copious* disregard of the political economy of speech, both general and restricted? If the basis of Falstaff s base comparisons was his immunity as an allowed fool, then his rhetoric fails to foil his subsequent rejection; perhaps a prince, become king, believes it necessary to pare down base comparisons so as to repair the health of the body politic?

A comparison is a commonplace. Comparison, in Classical rhetoric, is a common *topic* (topos = place) of 'invention' (*inventio*), and may proceed along the trajectory of similarity/ difference or of degree, incarnated in a corresponding *figure*, such as a metaphor or a simile. To compare, one could say then, is to find a place - more, or less, common. A place for one, alongside another; a place which could always be for an *other* one. If, as Mallarme said, nothing takes place (will have taken place) but the place, then to place together, and be placed together, to compare and be compared, always under the sign(-ature) of the incomparable, lie at the heart of the human (or hermeneutic) condition and make for the compossibility, and the condition of possibility, of discourse.

The topic that lies athwart - be-lies it maybe - this essay shall be comparison - a place which calls to it and which it feels constrained to call into question. A question, we shall see, that institutes its own in-quest and (con)serves the condition of possibility of that jouissive[1] event of sustained semantic displacement which we, now and then, perhaps a little absently, call poetry. It is for the pilgrim to (pre)pare the path of his quest. Accordingly, I shall confine myself, mainly, to two common-places of comparison: Shakespeare's Sonnets 18 and 130, works/ texts which commonly find a place in most collections and many classrooms. The sonnets -more an ensemble than a sequence - inscribe themselves within a quasi-diegetic quadrilateral of comparisons and contaminations circulating, with no discernible teleology, amongst Young Man, Dark Lady, Poet, Rival Poet, spied upon by a reader invited - nudged - to look through the keyhole, cursorily. By speaking of 'two loves' and glancing at a rival is (not) the poet inviting comparison, if only to disarm it?

'Shall I compare thee to a summer's day?' Sonnet 18 asks and answers in an elaborate, yet elliptical, negative designed to affirm by means of transposed attribution. In so doing, perhaps, the apostrophe queers its own rhetorical pitch. A composition confessedly in search of a comparison, the sonnet proceeds quickly to confute the claims of the discarded vehicle and to confirm those of the tenor,[2] but not before the questioning gambit of 'this' particular language game has called its own rhetorical rules into question. The problem that confronts, and compels, composition - a little more precisely the (in)scriptorial *incipit*- here is a primordial one - the incommensurability of word and thing (in the register of being and/or meaning), *res* and *verba* (in the register of topic), tenor and vehicle (in the register of the figure). The poet is rhetorically constrained to make a move from *res* to *verba*, find a vehicle for the tenor. He moves on by leaving the vehicle a vacuum and verbalizing the res (*splendens*) *via negationem*, i.e. by voiding it, by choosing, it would seem, to displace the resisting, founding, figure.

The purpose of a question, Jean-Jacques Lecercle says, is not 'to solicit information but to elicit an answer.'[3] To the question that opens the sonnet the implicit, expected, immediate answer must be

'no'; 'a summer's day' is considered and summarily rejected as an unsuitable, because inadequate, comparison. The young man is more lovely and more temperate. The first two quatrains go on to show how and why a summer's day is ill-tempered, and further on to the conclusion: 'And every fair from fair sometime declines,' thus conjugating temperance with temporality, whose transcendence the final quatrain promises: 'But thy eternal summer shall not fade.' By this hyperbolical, hence intemperate, assertion the text takes a turn away from the time-bound to the timeless, from the provisional to the permanent. Or so it seems.

The young man cannot be compared to a summer's day because he is more temperate. A summer's day is less temperate, presumably, because it is prey to the contingencies of time. The summer of the young man's youth is eternal while summers in nature are evanescent. Temperateness, then, can apparently preserve itself only by abstracting itself from time. But such abstraction would mean annihilation. The youth's eternal summer, the quatrain concludes, would continue to grow in time in eternal lines. Temperateness, then, is not a static, fixed mean between unseasonable extremes but, somewhat paradoxically, an eternal extension that will always have grown more temperate. 'Tis a figural fulcrum, a fluxious mark that is, that must be, at one and the same time, ever-fixed. Any analogy drawn from nature would therefore be inadequate; the young man, in a word, is without compare/compeer. It is as if to compare him to some *thing* else would be to efface his eternity and give him up to nature, chance, death.[4]

The temperate is (optimally) temperate only in comparison to the (unpleasantly) intemperate extremes. But if, and when, as here, temperateness is itself made susceptible to comparison, and quantification, the quality of temperateness itself, perhaps, becomes a little distempered, since qualified. But then, for some (one) to be more temperate than some other -as for some animals to be more equal than some others - it only needs to be said so. But what price temperateness? Where, and how, does it lie in the text? To ask this is to ask what purpose does it serve, and what place it holds, within the logical and rhetorical architectonics of the poem.

In Sonnet 18 'thee', i.e. the young man apostrophized by the 'I', is the tenor. 'A summer's day' is considered as a possible vehicle but rejected. The next line furnishes the *tertium comparatio*, and the reason why the vehicle is rejected. The tenor and the vehicle are alike in being temperate, but not alike enough. The *tertium* fails on the count of degree. Curiously, the vehicle is dismissed but not the attribute attached to the tenor. It is tempting to ask to what extent is the *tertium* a necessary attribute of either vehicle or tenor, and more importantly, of the conclusion reached by the sonnet. Perhaps the *tertium's* function is merely *tertiary*? The lines that follow immediately disattach the attribute, thus the *tertium*, from the already disattached vehicle. It is shown that a summer's day is not really temperate. This proved, the point shifts from the youth's being temperate to his being preserved for all time, a rather intemperate claim. What the reader is not told is what the young man is like, or even what eternal summer, which comes to act as the vehicular attribute, is like. A question is asked only to be left unanswered. A (mis)leading question? A comparison assayed, only to be confounded? The substantiality of the substance is articulated by way of negative, paradoxical, impossible attribution and so rendered no more, nor less, than a semiotic effect whose referent is determined only by *de*-scription. And thus is a person(a) *made*... into a poem, and yet only, retroactively, *of* it.

The young man is shown to be incomparable, but only by making a comparison between a natural and an eternal summer. A comparison that is never 'grounded'. The conceit of being-temperate comes to figurally condense both moderateness *and* extremity. The incomparable eternal summer of the young man not only rebounds to but is shown to result from the poet's eternal lines, whose fame can only grow and which no comparison can diminish. Not only the textuality of being - the necessity or contingency of whose condition is a different, though determinative, question - but the very conceit of (impossible) comparison comes to manifest itself as the latent (pre)condition of composition, poetic and otherwise. The problematic of comparison, then, reflexively articulates itself as its own absent, enabling, thematic *(ab-)grund and ur-grund*. As its ungrounded groundless ground. The eternal deferral - and displacement -of the sonnet's ostensible descriptive-epideictic end ensures the eternity of its lines. The reader is put in mind that to compare and to compose[5] both mean to place with, place beside, place together, place against - an imperative as necessary as it is impossible.

The rhetorical invocation and subsequent revocation of the t(r)opic of comparison articulates not only the inadequacy and impossibility of comparison, but also, at once, its uselessness and ubiquity, as evidenced in the mimetic reversal of the concluding couplet. The uncompared inspiration and original of 'this' ensemble of eternal lines is shown, and will have been shown, 'so long as eyes can see,' to be its effect. The redoubled deictic foregrounding of 'this' (textual instance) which lives *now*, and will *live* hereafter, thus also foregrounds its singular universality which shall 'be'[6](-come) not only 'for all time' (to come) but always (*with*-) *in* time for all eyes, severally. To paraphrase, a little heretically: thy eternal summer owes itself to my lines, but where would my lines be without the light of thy eternal summer? *Et ergo contra*. Intemperate summer is not sempiternal. But the return of summer is eternal, which is the tropic season when love may 'turn' (trope = 'a turn'). If a poem is the process of its reading, and every reading a misreading, as Harold Bloom[7] likes to say, a poem procures its permanence by putting its perilous provisionality out on the line where each instance of misprision-will belie -give the lie to - the lie of the text wherein lies the (t)here-being, i.e. becoming poem, of a poem.

If the purpose of a question is to elicit an answer such that the questioner's right to question is, *eo ipso*, performatively mandated, is the purpose of a leading question, then, to mislead? 'What are we to say of inquiries and questions?' Longinus asks rhetorically anent the rhetorical question and further, 'Should we not say that they increase the realism and vigour of the writing by the actual form of the figure?' What would have been 'quite trivial' if put in 'straightforward form' becomes 'not only more sublime but more credible' when framed as a question, feels Longinus, owing to the 'impassioned rapidity of question and answer and the device of self-objection [which] arrests the hearer and *cheats*' him into believing... [my emphasis].'[8]

Where Sonnet 18 raises the question of the inadequacy of comparison, Sonnet 130 questions its ethico-epistemological veracity and validity. The two questions are not coterminous, but they are cognate, and each concerns the *quiddity* of poetic composition/ communication. In Sonnet 130 negation is tropically foregrounded as the rhetorical *ne plus ultra*[9]. This sonnet is an example *par excellence* of a blank/black blazon, wherein the sonneteer dutifully de-scribes (and de-picts) what his mistress is *not* like, to close with the cryptic, and aporetic, assertion: 'And yet, by heaven, I think my love as rare/As any she belied with false compare.'

'Now, sir, what is your text?'
'Where lies your text?'

Does the being-of-text lie in being belied? The trouble, yet again, lies in the *topos* of comparison, a common place which, perhaps, has here made pause to consider its conceptual-categorical commonality. The Progymnasmata, exercises designed to train pupils in rhetoric in classical antiquity, envisaged the topic (one of the *koiné topoi*) of comparison (synkrisis) as a double encomium involving the apportionment of praise or blame, or of both, where the objects of comparison would be placed side by side and their respective attributes and accidents enumerated. This disposition (*dispositio*) or ordonnance of this epideictic exercise/performance could take the following form: *exordium*> *narratio*>*divisio*>*confirmatio-confutatio*>*conclusio*. Peter G. Platt summarizes:

> The orator began with an introduction, an entrance into his topic (exordium), what we might now call a 'hook'. After laying out the facts in the narratio— and in some schemes taking a brief detour (*digressio*) - the rhetor would bring the terms of the dispute to the foreground in the divisio, informing the audience of the points of agreement and disagreement between him and his opponent. From there, he put forth the arguments that supported his case (*confirmatio*) and refuted the opponent's claims (*confutatio*). Finally, the orator rehearsed his arguments and sought to excite the audience into a lasting acceptance of his claims (*conclusion or peroratio*).

In the process, *epideuxis* has harked back to, and shaded into, the originary forensic function of rhetoric. It will be seen that the *rhaetor* in Sonnet 130 keeps, in the main, to a similar plan of argumentation. He does not digress, because he does not need to, and does not state his theme (exordium) explicitly. It is clear from the outset, though, that the 'topic' is 'she'. He narrates what his mistress is *not* like and what other(s') mistresses, presumably, *are* like, by apparent attribution; he divides his data neatly and makes his point - that his 'mistress when she walks treads the ground' - clinched in the concluding couplet. What, though, does the conclusion conclude? What, if anything, does the peroration, and the whole poem, confirm or confute? It is easier to hazard an answer as to what it does *not* confute or confirm—

1) That his love is any more or less rare than any other(s').
2) That his she is any more or less belied than any other(s').
3) That his she is any more or less false than any other(s').
4) That his mode of comparison (hence composition) is any more or less false than any other(s').

Since the rarity of the attributes listed - as common terms for comparison - but not labelled onto *this* she whose character remains in the dark, are rather common or garden, the quality of rarity itself is, likely, put under some strain. The 'point of view' remains as dark as the view itself. Comparison treads the ground precisely by refusing to ground itself by way of affirmation or negation. The poem,' one would like to repeat after Celan, 'holds its ground on its own margin.' This compels a question: is the qualifying falseness of comparison a universal qualifier? Is the poet-*rhaetor* speaking false? The only thing he(?) *does* seem to claim for himself— i.e. his(?) (abstracted, absolute, (im)personal, performative) voice— is that *he thinks... his love*...is *rare*...

A Platonic - and also Puritan - unease about, and concern over, the veridiction of rhetoric, and hence of poetry, it appears, was a common topic in Early Modern discursive England. And so also

in Shakespeare. To Cesario/Viola's 'Alas, I took great pains to study it, and 'tis poetical,' Olivia returns pat, 'It is the more like to be feigned, I pray you keep it in.' In *A Midsummer Night's Dream* Egeus accuses Lysander (Lies-Ander) of having 'given her rhymes' and of having 'sung [w]ith feigning voice, verses of feigning love.' Rhetoric is accused rhetorically - paronomastically. Theseus's theory of the imagination - whose singularly common sign singes the lunatic, lover and poet, severally - entails a confusion of the faculties which takes the form of misnaming, of miscomparison, of a misconnection or false conjunction between *res* and *verba*. Of misperception and misprision. As a result a frantic lover '[s]ees Helen's beauty in a brow of Egypt' and a bush is easily supposed a bear. As if putting theory into practice, according *res* its *verba*, the 'rude mechanicals' carry miscomparison - i.e. miscollocation, misconjunction, misnomination, misattribution— as far as it could plausibly be carried on stage. Thisbe's fluting threnody,

> These lily lips,
> This cherry nose,
> These yellow cowslip cheeks,
> Are gone, are gone.
> Lovers, make moan.
> His eyes were green as leeks

raises laughter - and possibly some eyebrows. One wonders why. Is it rare, or risible, for an access of grief- or ecstasy- to dis-place, dis-order the decorous ordonnance of discourse, of discursive convention (which is the same thing as good manners), to throw speech - and analogy - out of joint? Dislocated by imagination off local habitation and name, the mechanicals become rude martextual tresspassers- in-ventive interlopers— on the polite, privileged field of *already mandated* mimetic/metaphoric mechanism/masquerade and so make profound play with the properties/proprieties of a play-world. George Puttenham, the Early Modern English rhetorician, is of the opinion that disorder betokens indecency.[10]

In *As You Like it* a courteous Touchstone tars the 'poet's pen' with being perfidious, but not before wishing for a 'poetical' object of attention, and possibly affection.

> TOUCHSTONE When a man's verses cannot be understood, nor a man's good wit seconded with the forward child, understanding, it strikes a man more dead than a great reckoning in a little room. Truly, I would the gods had made thee poetical.
>
> AUDREY I do not know what poetical is. Is it honest in deed and word? Is it a true thing?
>
> TOUCHSTONE No, truly; for the truest poetry is the most faining, and lovers are given to poetry, and what they swear in poetry may be said, as lovers, they do feign.
>
> AUDREY Do you wish then that the gods had made me poetical?
>
> TOUCHSTONE I do truly, for thou swear'st to me thou art honest. Now if thou wert a poet I might have some hope thou didst feign.

In a deft dialectical flip, being 'poetical' passes wishfully over into being 'a poet'; being a poet holds out the hope to feign. Touchstone is a fool, albeit 'a material fool': belike his mottled musings belie foolishness. What is a fool? A player upon words.[11] What are players? Men and Women.[12] *Totus mundus*

agit histrionem. Lovers are given to poetry, and to feigning - a 'mere folly'? The poet-lover of the sonnets too attests to having 'made' himself 'a motley'...'to the view', and confesses to having lied... poetically.[13] If 'most loving [is] mere folly', then may be the most a lover can vouch is that his love is merely as rare as any other(s'); to say any more, or less, may be protesting too much— or too little.[14]

'I do not know what poetical is. Is it honest in/deed and word? Is it a true thing?' This is at once confession and question. A set of very difficult questions, put very simply. The premise of the question takes it for granted that that thing which is (called) poetical, honest or no, not only says but *does... something* (and perhaps makes *some*thing happen).[15] A text is also, one should suppose, an act. To call it a discursive act should not detract from the materiality of the poetical act *qua* act. Is this thing which is 'poetical' (the poem? the poet? the poetaster? the poeticized?) a *true* thing? Is this thing a *thing*? Does *res poetica* have residence outside of (*rerum*) *verba*? Does *res* outlie *verba*? What is it to feign?

The poet,' says Fernando Pessoa, a poet, 'is a faker.' So much so that he fakes even the pain that he 'in fact' feels. But he also writes, in a poem called 'This', 'They say I lie or feign/ In all I write. Not true. It's simply that I feel/Via the imagination.' For George Puttenham a poet is a dissembler. In so far as the poet is a courtier - the kind of poet who is Puttenham's especial concern, and the kind of poet Touchstone affects to touch on— he *has to be a dissembler* in order to have the ear of his master...or mistress. However, since Puttenham is constrained to give the English courtier-poet (but not his continental compeers) 'the name of an honest man, and not of an hypocrite' he will 'allow our Courtly Poet to be a dissembler only in the subtilties of his arte: that is, when he is most artificiall,' but concedes that 'our courtly Poet do dissemble not onely his countenances and conceits, but also all his ordinary actions of behaviour, or the most part of them, whereby the better to winne his purposes and good advantages.' Puttenham has put his finger on the *pragmatic* end of *epideuxis*. But has he answered Audrey's question? Speaking of the apostrophe, which he calls 'the turnetale', Puttenham writes:

> if the things we covet to describe be not naturall or nor veritable, than yet the same axeth more cunning to do it, because to faine a thing that never was nor is like to be, proceedeth of a greater wit and sharper invention than to describe things that be true.

For Philip Sidney,

> if the question were, whether it were better to have a particular act truly or falsly set downe, there is no doubt which is to be chosen, no more than whether you had rather have *Vespacian's* Picture right as he was, or at the Painter's pleasure nothing resembling. But if the question be for your owne use and learning, whether it be better to have it set downe as it should be, or as it was; then certainly is more doctrinable, the fained *Cyrus* in *Xenophon*, than the true *Cyrus* in *Iustin* and fained *Aeneas* in *Virgil*, than the right Aeneas in *Dares Phrigius*.

It is significant that Sidney should invoke use value— of poetry and poets, of criticism and critics, and above all of rhetoric and representation— as the touchstone of the truth value of literary discourse. A poet is a teacher and 'a fained example hath as much force to teach, as a true example (...since the fained may be tuned to the highest key of passion).' The Platonic objection to poetry is 'that it is the mother of lies.' Sidney's refutation is that 'the poet... nothing affirmeth, and therefore never lieth.. .though he recount things not true, yet *because he telleth them not for true*, he lieth not

[my emphasis].' Further, not only does the poet need not lie, but according to Sidney he *cannoi* lie: 'I answere *Paradoxically*, but truly, I think truly: that of all writers under the Sunne, the *Poet* is the least Iyer: *and though he would*, *as a* Poet *can scarcely be a lyeir* [my emphasis].' The poet cannot lie even if he list.

Puttenham writes, 'ye shall know that we may dissemble, *I meane speake otherwise than we thinke*, in earnest as well as in sport, under covert and darke termes... *and finally as well when we lye as when we tell truth* [my emphasis].' Dissimulation - feigning - then is not necessarily coterminous with or equivalent to mendacity. Feigning is not *necessarily* speaking false. But since what it involves is a conjunct disjunction between 'this' and 'that' - between *res* and *verba* - is it common to all discourse, and foregrounded in poetical discourse? When dissimulation is designed to delight - or detract— 'we [may] be allowed now and then to over-reach a little by way of comparison.'

Comparison, for Puttenham, involves 'confronting... together.' This confrontation, of this against that, is a re(s)-presentation— a verbal presentation of *res*. The *topos* of comparison within the tradition of Classical and Renaissance rhetoric, it can be seen, is articulated with, and as, confrontation and evaluation. Within the *economimetic* and *ecotoponomic* negativity— darkness— within the mimetic negation and negated common *topos*— of the sonnet its vectorial infinite d/referral of *this* she (tenor) to *that* other, an(y) other, she (vehicle), *ad infinitum*, plunges the mimetic mechanism of the poem into an infinitely deferred— and perhaps *in*consequential— contramimet(r)ic(k) analogical *mise en abyme*.

Rhetoric means, and is, among other things, mediation between *res* and *verba*. The royal road open to the poet and/or *rhaetor* to effect this mediation - also known as magic—[16] is ornamentation or verbal equipment (*ornare*= 'to equip'). An especially favoured mode of ornamentation, in the canons of Classical and Renaissance rhetoric (as evidenced in influential and popular manuals by Cicero, Erasmus *et. al.*), was a seasonable sprinkling of *copia*— i.e. superabundance of thought and expression. In other words, calculated excess. Living and working within this tradition— whether insouciant or indifferent one shall never learn— the sonneteer chooses *d*ecopiation— *d*enegation— as the ornament best suited to a she who is, and shall have remained, stark, dark. A refusal to reify takes the form of a rhetoric of refusal.

For Orsino, love is ever moving but for its mooring in the constant image of the beloved. By refusing to give his readers a constant image- which would be very like an image of constancy— what, if anything, is the sonneteer refusing? The sonneteer, we are told, has seen 'roses damasked' [dam(n) masked], and *this* she is none such. We remember, with Orsino, that women fade like roses once displayed. We remember, with Paul Eluard, that what has been *ex*-pressed ceases to exist. Perhaps the image not imaginable is made so as to 'rile by rule of ruse 'reathed rose...?"[17] It insists...

If ornamentation is representation and representation mediation, what are the possible modalities of such mediation? Mediation between thing (*res*) and word (*verbum*). But *res*, in the terminology of rhetoric, is thought; *verbum* its expression. *Res* is the concept, *verba* its configuration; this is made clearer in the corresponding, equivalent, originary combinatory in Greek: *logos/lexis*. *Res* is thus always already represented, and *verba* the representative of a representation, which shall always already have (re)acted upon the always already represented *res* retroactively. The *topos* of comparison condenses this

dialectical double bind *without* conflating (and thus neutralizing) the component conceptual/semiotic categories (the two or more terms of comparison as well as their ground, and the operation itself) in so far as it articulates itself not only as comportment of word and word but also of world and world, to the extent the two registers suffer segregation.

In the *Rhetorica ad Herennium* (c.90BCE), Book IV, comparison (parabolel similitudo) is classed as a figure of thought. To think [*penser*],' Jacques Derrida says somewhere, 'is to compensate, to counter-balance, to compare, to examine.' Thought steps, this way and that, by pairing this with that, by paring this by that, by weighing [peser] this by that. To think is to confront thought with thought, thing with thing, word with word, world with world, this with that. To think is to represent representation itself to itself, by way of refracted reflex. To think is to compare, and to compare is to *dis*-place *this* with *that*, from *this* place to *that*, a displacement which could be a *re*-placement only in the sense of, *by way of*, supplementation, not substitution (which would amount to conflation, i.e. attempted erasure and colonization of difference).[18]

'Which title is the true-to-type motto-in-lieu for that Tick for Teac [.. .]?'[19] As students of logic know, truth is often tautological. When Feste in *Twelfth Night*, quoting an old hermit of Prague's 'That that is, is' asks, rhetorically (?), '*What is "that" but "that"? and "is" but 'is"?*' he is offering at once a critique and conspectus of comparison- but also, by the very same (or similar) token, of the *cogito*— the basis for all (self-) comparison, as also of that cradle of the *cogito*-language, which is always rhetorical and sometimes poetic(al). Rhetoric, as Emmanuel Levinas says (and many others have said, or implied, since Isocrates) is not only 'the knowledge of certain "figures" of the *said* (*rhaetor* is from *rhaema* = what is said) but also 'these figures of discourse themselves, the structure that belongs to language. Already at the level of elementary analysis, discourse does not appear in the simplicity of a relation connecting, on a one-to-one basis, verbal signs and their corresponding realities.' Levinas, again:

> The function of language would appear to be not just to express- faithfully or unfaithfully - a prior, totally internal thought: its rhetoric seems a part of the intellectual act, and to be the very intrigue in which *this-as-that* [emphasis in original] is assembled; a this-as-that at the heart of a *datum* that, according to Heidegger's usage, would already be a world; this-as-that, the paradigm or infrastructure of the metaphor in the broadest sense - all metonymy, all synecdoche.'

The *paradigm* of this datum of this-as-that would be a 'creative or poetic work rather than a simple association by resemblance.' True. But are things poetical so simply formulable?[20] To look *only* at the *topos* of comparison: the 'work' of comparison, a creative work, is concerned not only with this-as-that but also with this-*with/ against*-that (in other words with displacement more than with replacement)- both registers of representation condensed in the figuration this-*by*-that.

Simply put, since *nihil idem simile est*- which renders an(y) instance of *quid pro quo*, *eo ipso*, *non sequitur*-, the quiddity of comparison would lie in it's *a priori* impossibility; it is compelled to put this beside that and that beside this, but is never able to convey the essential 'thisness' of either this or that. By comparing this with that the thisness of this and the thatness of that are alike severally compromised. Even so, it is only with reference to that that this may mean, or be, and *vice versa*. Comparison, then, appears to be the necessary, and necessarily compromising, contingency constitutive of, and consequent upon, all predication. Poetry-good poetry- tries to confront this

double b(l)ind while idle chatter[21] tries to pass it up. Good rhetoric demonstrates that what cannot be compared need not be passed over in silence,[22] but rather silence may be made to signify, braving the noise of 'communication'.[23] 'It is,' as Levinas says, 'in the distance between the senses of words that meaning means.' In the words of a poet, Paul Celan, 'Art makes for distance from the I. Art requires that we travel a certain space in a certain direction, on a certain road.' The poem is this space as well as its traversal, and quest.

This-as-that', which, as can be seen, is a formula of the metaphor, i.e. the paradigm of paradigmatic shift, 'is not without context [Levinas].' To listen to Audrey, yet again, the comparative veracity, or otherwise, of 'poetical' discourse can have a meaning only in comparison to plain speech, everyday discourse, a discourse whose rhetoric Levinas characterizes as being non-eloquent. The 'confrontation of the metaphorical with everyday language' then comes to concern 'the protection of truth from eloquence.' As Levinas explains, not only is it 'difficult to separate language and rhetoric,' '[t]here is... no question, [even] in [a] return to everyday language, of having the vernacular, as "truth", replace the... language of speculation and poetry, in which rhetoric is less fixed, and in which metaphor, talent and invention are more alive.' Eloquence entails seduction *and* sacredness, and may operate independently of truth. Further, '[a] language directed against eloquence in turn becomes eloquence.'

The plain style of Sonnet 130 becomes a paradigm, ludic locus, of paronomastic plurisignation. The mist-tress she whose ayes are no and 'I's (which shift along the sonnet-slope) No-Thing (because localizable nowhere, located beyond the symbolic mandate of naming and nay-saying, i.e. semantic delimiting, and hence beyond the dialectic of identity and difference, of identity built upon difference), is no more nor less than an eloquent ellipsis- a trace to be missed and made... momently. The be(com)ing poem of the poem lying in its be(com)ing to be-lied.

The poet,' according to Philip Sidney, 'is indeed the right popular philosopher.' For Martin Heidegger the truth of philosophy- founded as it is on interpretation or unconcealment of Being *qua* being-in-the-world (*dasein*)— approaches the condition of the poem. Alain Badiou writes (disapprovingly), '[r]egarding the question of truth, the Heideggerian edifice leaves no other solution than that of the poem.' For Heidegger, poetry which is 'authentic and great' is *essentially* superior in spirit to what is 'purely science'; 'the poet always speaks as if being was expressed and called upon for the first time.'

We remember, that while for Plato the poet is a pathological liar for Sidney he is a pathological truth-teller who is *practically incapable* of lying. The criterion for both poet-thinkers is a comparison of the represented with that which is (mis)represented, an operation Sidney describes as mimesis *or/as* representation, set side by side. So, if comparison is *koinos topos*, one could say, with/after Paul Celan, that the poem is *u-topos*. It is also *tropos*, turn, for Celan an *Atemwende*, a turn of breath... If comparison is confrontation (as Puttenham believes), for Celan the poem is the place, the turning-place, the taking-place, (as Mallarme would have put it), of confrontation- of I with Thou, I with Other, I with I (which is an other), I with *it*, even as the poem is the traversal of, and search for, this place which is not self-same. If truth, as Badiou says, is *a hole without borders in knowledge*, then the truth of poetry must be the taking place of a no(*n*)place. A non-place is, perhaps, a good place, just as no news is good news.

A poet is a chameleon. A poem, too, is a chameleon. A poem is a text. So also a poet. A poem is a work. So also a poet. A poem is a sign. So also a poet. A poem is also a *noem*. A poem is a breath. A break of a breath. A poem is a place. A new place. A strange place. A meeting place. A place of strange meeting. An arrival. A departure. Delay, Relay. Too early, and too late- always. In a poem poetry finds its passage. In a poem poetry comes to be. In poetry language belies its self. In poetry language lives itself. '[F]reed to its own open space, language can concern itself solely with itself alone,' says Heidegger. I should like to leave this space, this place, this place of predications athwart the (properly) poetical - another (proper) name for the abyssal -, this place of singular discursive community - of concerned commonality, this free place, I should like to leave this place(=page=stage) open with a poem that lies in wait for, and shall have st(r)ayed in search of, shall have belied, its poet...still

this by that
that by this
a dab here
a daub here
ginger gestures
made
twowords
thusness
whose
purple thaumaturgy
inflames
intention
unthawed
unmade

NOTES

1. *Jouissance*, as conceptualized in Lacanian psychoanalysis, is enjoyment. It comprehends and may go beyond enjoy-meant (*jouis-sens*) towards, onto, the enjoyment of non-sense and non-meaning, i.e. of language in its it(t)era/littoral materiality (*lalangue*); it entails an *act*, and an articulation of rapture/ rupture across an abyss that resists symbolization, and hence is an instantiation of the Real negated by reality'. As such, *jouissance* is to be distinguished from pleasure (*plaisir*), i.e. the satisfaction afforded by passive, normalizing, fetishistic, risk-free consumption of commodities (which includes works of art). *Jouir* is 'to come'.
2. In 'My love is like a red, red rose' 'love' is the tenor, 'rose' the vehicle, redness the *tertium comparationis*, the (common) ground of comparison. The adjective 'red' is reduplicated for rhetorical emphasis and metrical cadence. It qualifies the noun 'rose'. It is also the attribute that attaches to, and more significantly, defines, the substance (and substantive, i.e. noun) 'rose' , and is figurally transferred onto the tenor 'my love' which is also the subject of the sentence. What we see, then, is

that it is the adjective which lends meaning to the noun, the attribute ('accident' in Scholastic philosophy) to the substance, and the predicate to the the subject although the subject may appear to enjoy syntactic and semantic precedence over predicate, substance over attribute, tenor over vehicle. 'Shall I compare thee. ..?' institutes the subject as an effect of the predicate, even as it escapes predication; by boldly proclaiming his problem the poet makes a virtue out of necessity, and eloquence out of the expressly ineffable.

3. Which establishes 'a relation of power between questioner and question.'
4. But also, by the same token, to the *contingent processes* of sexual/textual (re)production (i.e. quasi-mimetic dis-semination) - a principal concern, indeed preoccupation, of the sonnets at several registers at once.
5. And, perhaps, to comprehend.
6. Archibald Macleish: 'a poem must not mean but be.'
7. For Bloom's hermeneutics of *Oedipal meconnaissance*, see, *inter alia*, *The Anxiety of Influence, A Map of Miscreading*.
8. Longinus's emphasis in this brief passage is not exclusively on epideictic rhetoric and his particular concern here is the effective (dis)simulation of spontaneity. But borders, though, discursive or otherwise, have a habit of crossing and recrossing their determinations.
9. The gesture of negation is itself subject to and articulated with the conditional- 'if...
10. Puttenham translates Latin 'decorum' as 'decency', a concept of at once rhetorical, moral and political valence. He calls *Allegoria* the chief ringleader and captaine of all other figures, either in the Poeticall or oratorie science'. Puttenham calls it 'the Courtly figure' and a figure of 'false semblant or dissimulation'. Defined broadly as a figure wherewith 'we speake one thing and thinke another, [such] that our wordes and our meanings meete not', it is in effect 'a long and perpetuall Metaphore.'
11. 'How every fool can play upon the word!': *The Merchant of Venice*.
12. 'All the world's a stage,/And all the men and women merely players.': *As You Like It*.
13. See Sonnets 110,115.
14. 'Most friendship is feigning, most loving mere folly.' *As You Like It*.
15. 'Poetry makes nothing happen.' W.H. Auden.
16. 'Mediation, which is the immediacy of all mental communication, is the fundamental problem of linguistic theory, and if one chooses to call this immediacy magic, then the primary problem of language is its magic. At the same time, the notion of the magic of language points to something else: its infiniteness.': Walter Benjamin. Language entails *mimesis* which entails the production and recognition of similarities, a faculty whose provenance and purport are magical, albeit residually. See 'On Language as Such and on the Language of Man' and 'On the Mimetic Faculty' in Benjamin, *Reflections*.
17. James Joyce: *Finnegans Wake*.
18. For the logic of supplementarity, see Derrida, *Of Grammatology*, especially 'This Dangerous Supplement'.
19. *Finnegans Wake*.
20. To be fair to Levinas, his concern in this essay is not so much poetical language as (the rhetoric of) everyday language.
21. For idle chatter see Heidegger, *Being and Time*.
22. 'What cannot be stated clearly must be passed over in silence.': Closing sentence of Ludwig Wittgenstein's *Tractatus Logico-Philosophicus*.

23. Alain Badiou regards communication, by which he means, chiefly, fragmentary, mediatized mass communication, as an enemy of philosophy: 'Communication transmits a universe... whose accepted principle is incoherence. Day after day communication undoes all relations and all principles, in an untenable juxtaposition that dissolves every relation between the elements it sweeps along in its flow.' Theodor Adorno (in *Minima Morala*) calls the 'demand' for 'universal communicability' a 'liberal fiction' which is 'wrong in itself as a principle of representation.' 'For the value of a thought is measured by its distance from the continuity of the familiar.'

FURTHER READINGS

Adorno, T. 1984. *Minima Moralia: Reflections from Damaged Life*, Trns. E.F.N. Jephcott, London: Verso.

Aristotle. 2001. *Rhetoric*, Trns. W. Rhys Roberts in *The Basic Works of 'Aristotle'* Ed. Richard McKeon, New York: Random House.

Badiou, A. 2005. *Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy*, Trns. & Eds. Oliver Feltham and Justin Clemens, London and New York: Continuum.

Benjamin, W. 2007. *Reflections*, Trns. Edmund Jephcott, Ed. Peter Demetz, New York: Schocken Books.

Bierce, A. 1996. *The Devil's Dictionary*, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd.

Celan, P. 2003. The Meridian', in *Collected Prose*, Trns. & Ed. Rosmarie Waldrop (New York: Routledge.

Derrida, J. 2004. 'Uninterrupted Dialogue: Between Two Infinities, The Poem', Trns. Thomas Dutoit and Philippe Romanski in *Research in Phenomenology* '34(1).

Heidegger, M. 2001. *Poetry, Language, Thought*, Trns. Albert Hofstadter, New York: Harper Collins.

Heidegger, M. 2008. *Basic Writings*, Ed. David Farrell Krell. New York: Harper Collins.

Joyce, J. 2000. *Finnegans Wake*, London and New York: Penguin Books.

Lecercle, J. J. 1990. *The Violence of Language*, London and New York: Routledge.

Levinas, E. 1993. *Outside The Subject*, Trns. Michael B. Smith, London: The Athlone Press.

Longinus. 1998. 'On Sublimity', in *Classical Literary Criticism*, Eds. D.A. Russel and M. Winterbottom, Oxford and New York: Oxford University Press.

Pessoa, F. 2003. *Fernando Pessoa & Co.: Selected Poems*, Trns. & Ed. Richard Zenith, New York: Grove Press.

Platt, P. G. 1999. 'Shakespeare and Rhetorical Culture' in *A Companion to Shakespeare*, Ed. David Scott Kastan, Oxford: Blackwell.

Puttenham, G. *The Arte of English Poesie*, Project Gutenberg Ebook (#16420, Release Date Aug. 2005; First Published London:1589).

Shakespeare, W. 2005. *The Complete Works, 2nd Edn.*, Eds. Stanley Wells and Gary Taylor, Oxford: Oxford University Press.

Sidney, P. *A Defense of Poesie*, Project Gutenberg Ebook (#1962 Release Date Nov. 1999; First Published London: 1595).

Silva Rhetoricae, http://rhetoric.byu.edu/[accessed Oct. 2014].

bodhi kala vol.3 (no.2) pp.83-89

THE PROBLEM OF NEGATION

Sangeeta Chattopadhyay*

Negation is a form of denial. Any word which contains an element like 'not', 'non', un' etc negative is known as negative term. For eg., 'not good', 'non-blue', 'unintelligible' etc. Again, when a proposition starts with 'no' or when 'not' is attached to the copula of a proposition, we mark it as negative. For eg., 'The flower is not red'.

There are three major approaches to, what may roughly be called, the problem of negation and there are three corresponding theories in which negation figures as the subject matter - ontological, epistemological and logical theories.

In ontology it is discussed among other things the fact of negation, i.e., negation as an item of reality or negative fact. In Western philosophy many including Russell have discussed this point. Russell believes that no negative fact is possible. In Indian philosophy we also find that there are schools of thinkers who do not admit negative fact. But those who admit negative fact discuss in there theories why and on what ground we need to, or is justified in, admitting negative fact. This leads to the epistemological discussion of it.

The epistemological discussion here is about the means of knowing negative fact. There the question is can such fact be known by the same means which enable us to know the positive facts or some different means of knowing is to be admitted for negative facts? Here the controversy is mainly regarding the direct knowledge of negative fact. Russell also seem to have direct sensuous knowledge in mind when he held that in knowing a bare table we do not know in addition to the surface of the table the absence of ink pot. In the contrary we find in Indian philosophy there are schools which believe that we can have direct perception of negative fact.

In epistemology and logic we discuss about negative judgment .There the questions are how do the form and content of an affirmative judgment differ from those of a negative judgment when we make a negative judgment or do we assert something in addition? Here we can mention the view of F.H. Bradley according to whom pure negation can never be possible– negative judgment always presupposes some positive ground. In Nyaya theory of Indian philosophy we find also that the negatum of any denial must be something existent.

In this paper my aim is to link among the questions and issues which bring out the alternative dimensions of the theme.

The Ontological Perspective of Negation

The question that arises from the ontological perspective of negation is whether there are special facts that verify the truth of negative judgments. According to Russell, propositions become true or false depending upon whether they correspond truely or falsely with a particular fact in the world. Hence, Russell needed negative facts to account for the truth of negative judgments. Thus the

* Assistant Professor, Department of Philosophy, Bankura Sammilani College, Bankura

proposition that 'Socrates is not alive' is true only because of the fact in the world to which the proposition corresponds. For the proposition 'Socrates is alive' is a false proposition because it does not correspond to the facts of the world that 'Socretes is not alive'. Russell's solution is to define falsehood in terms of negation, i.e., "P" is not false = "not-P" is true.

It was hard for anyone to provide any clear argument against Russell's idea.One of his students at Harvard, Rapheal Demos, was able to give complete argument against negative facts. He states that falsehood can be defined not in terms of negation, but in terms of incompatibility. According to him, "not-p" is true = "There is some property q which is true and is incompatible with p". So, "Not (this is red)" can be defined as "There is some positive property (say, 'this is green ') which is true and which is incompatible with "This is red" (another positive property)."

Here Russell would say that incompatibilities, contradictions can exist only among our beliefs and not in the world. Because world is what it is and there cannot be logical incompatibilities in the world. Moreover, the incompatibility cannot be said to be a generalisatiion from experience. Whenever we perceive "this is blue", we can know that "this is not red". But the question is how can we know this? It cannot be a logical inference because to infer "this is not red" from "this is blue", we have to take the help of a general proposition - "for all possible values of x (where x is blue) implies x (where x is red)"- which is not empirical. Hence incompatibility is neither logical nor a generalisation from experience. Secondly, the theory makes a complex fact basic. The negative fact "not-p" is a complex since it is the truth-function of the fact "p". So "not-p' must be reduced to a basic fact. Now, "not-p" can be reduced to 'p is incompatible with q', is to say , 'there is a q and that q , such that p is incompatible with q'. But 'p is incompatible with q' is not at all a basic fact since it contains two elementary propositions, p and q. Thirdly, Russell believes that incompatibility cannot be between two facts, for incompatible facts would mean an incompatible world, which is logically impossible.

Even after defending arguments in support of negative facts, Russell subsequently rejects negative facts. He states that the predicate like 'non-red' is simply unanalysable, that is to say, whose meaning can only be grasped by acquaintance with what the predicate stand for. For eg., the meaning of the predicate 'red' can be understood only by seeing red things. Now, if 'non-red' is said to be unanalysable, then the meaning of it can also be understood by seeing non-red things. But as a matter of fact we can never see non-red things, what we see is some other colour. Moreover we cannot make a person understood what non-red means unless he has already understood the meaning of 'red'. So, if in order to grasp the meaning of 'non-red' one has to know the meaning of red, then non-red cannot be said to be unanalysable.

The problem still remains concerning an image-proposition. An image-proposition can be true or false depending upon its correspondence with the fact it stands for. If an image-proposition is always positive, since we cannot visualise a negative property, then how do we account for the falsehood of such propositions? Here Russell's answer is, "the 'not' belongs to the feeling, not to the content of the proposition". This view is found in his later work, 'An Inquiry into Meaning and Truth'. There the notion of acquaintance is replaced with the notion of "noticing". Noticing involves both perception (acquaintance) and a propositional attitude. He states, "A negative basic proposition thus requires a propositional attitude, in which the proposition concerned is the one which, on the basis

of perception, is denied." In his later work in "Human Knowledge", he makes his view more explicit. There he writes, "I think we may say that 'not' means something like: 'You do right to reject the belief....' And 'rejection' means, primarily, a movement of aversion. A belief is an impulse towards some action, and the word 'not' inhibits this impulse". Russell has by this time completely rejected negative facts because "the world can be described without the use of the word 'not'. If the sun is shining, the statement 'the sun is shining' describes a fact which takes place independently of the statement. But if the sun is not shining, there is not a fact sun-not-shining which is affirmed by the true statement 'the sun is not shining'."

In Indian philosophy we find certain school which does not admit negation as an independent category. Prabhakara Mimanmsaka belongs to this group. According to them negation can be represented as a positive entity. There is no non-existence over and above existence. Existence may be perceived either in itself or as related to something else. The apprehension of bare existence, of the locus in itself, is wrongly called non-existence. Thus the so-called 'non-existence of the jar on the ground' is nothing but the apprehension of the bare ground itself. Many objections to this view have been raised specially by Kumarila and Naiyayikas,, the two famous views in Indian system. They would argue that if the cognition of the absence of the jar is nothing but the cognition of the ground as without the jar, then the question is what is this 'withoutness'? Is it different from the ground or identical with it? If it is identical then we can have the cognition of the absence of the jar even when the jar is present. For 'withoutness' being identical with the ground, it is present whenever the ground is present. But this is absurd. Now, if , on the other hand, the 'withoutness' is different from the ground, then it is an entity as much objective as the locus. Another objection can be raised against Prabhakara. Suppose I have the awareness of a book on the table before me. Somebody takes this book away and the previous cognition disappears. There emerges a new cognition, i.e., the cognition which has for its object the table-in itself. Now, what will be the account for this change in the cognition? To those who admit negative fact, the answer is easy enough. They would say that the change in the cognition is due to the change in the objective fact i.e., the absence of the book. Here Prabhakara would say that the changed cognition is due to the removal of the book by somebody which is a kind of motion and this motion causes the cognition of the absence of the book. But there the objection will be that motion is something momentary and the cognition enduring, then how can an enduring effect be due to a momentary cause ? As a result Prabhakara modify their answer by saying that the changed cognition is not due to the motion but to the presence of the object in a new locus. That is, the cognition of the 'book on the table' has given way to the cognition of the table, not because of any absence of the book but only because of the book occupying a new objective position. But this is not so much a satisfactory answer.

The absence is always an absence of something, at a certain place and at a certain time. That of which there is an absence is called, in Indian terminology, the protiyogin. These three determinants are no doubt objectively real facts. And if the relation of absence to these can be defined, then absence got to be admitted as much real and objective as these.

Further, the denial of the facthood of the absence makes it impossible to deny the reality of the imaginary, the false or the contradictory. If absence is not regarded as a real fact, then the non-

existence of the golden river or the square circle is also not a fact and therefore, the existence of such an entity has got to be admitted. But admitting negative fact it is easy to answer to this situation. That is, the 'real absence of A' is simply another way of saying that 'Reality excludes the object A' (Bergson).

Those who believe in negative fact would say that if an affirmative judgment is an assertion about reality, so is a negative one. The difference between the two is due to the difference in the objective situation answering to the judgments. The objective basis of the judgment 'no jar is on the ground' is what is called 'absence'. So the only proof of a negative judgment can be derived frtom the facthood of such a cognition, whose existence can be denied only by a denial of fact .Hence the ontological discussion of the negation further leads to the epistemological discussion of it.

Negation from Epistemological ferspection

The epistemological discussion of negation is mainly concerned with the discussion about the negative judgment and the means of knowing the negation.

In ordinary language negation means the speech of act of negating. In other words, the act of negating is expressed through the negative judgments. Now, the question is, in a negative judgment what do we deny? Many philosophers believe that no negation can be bare or mere negation and that whenever anything is denied, some positive ground of denial is assumed. Here we can refer to the view of F.H.Bradley according to whom pure negation can never be possible - negative judgment always presupposes some positive ground. In the negative judgment 'The tree is not yellow', the positive relation of "yellow" to the tree must precede the exclusion of that relation. Bradley maintains that in an affirmative judgment a person attributes the content of the judgment directly to the real itself. Seeing a green tree before him, he will be able to formulate explicitly the content of his perception and make the affirmative judgment 'That tree is green'. So here he attributes an ideal content directly to the real as it is present in his perception. But negation is never the denial of an existing judgment. For judgment always expresses certain beliefs and it is not the case that what we deny we must once have believed. In his own words, "Since belief and disbelief are incompatible, the negative judgment would in this way be made to depend on an element which , alike by its existence or its disappearance, would remove the negation itself, What we deny is not the reference of the idea to the actual fact. It is the mere idea of the fact, as so qualified, which negation excludes." In "A is not B" the real fact is a quality x that belongs to A, and it is incompatible with B. We can not deny B without affirming in A the pre-existence of this quality. But in negative judgment the quality x is not explicit.

There can be various kinds of negative judgment as there are varities of affirmation. It may have the content of present perception ("this flower is not red")or it may be about that which we do not perceive ("It did not freeze last night") or it may be the denial of a general connection ("A metal need not be heavier than water"). But whatever may be its kind, "in all negative judgments, the ultimate subject is the reality that comes to us in presentation". So, according to Bradley, every judgment, positive or negative, is in an existential.

In Indian philosophy also we find that there can never be pure negation. The absence is always the absence of something, which is termed, as we have seen, as protiyogin. Any specific absence is due to a specific protiyogin.That is to say , for the cognition of a specific absence, a previous cognition

of protiyogin is necessary. For e.g., without the idea of rose there cannot be the cognition of the 'absence of rose'. Here the relation of the cognition of the absence and the idea of rose is the relation of inclusion. The idea of rose is included in the cognition of the absence of rose, just as the shape of a thing is included in the thing. Here we are concerned only with the definite absence. In case of indefinite absence, where we are not aware of protiyogi or where we do not notice the absence, the previous cognition of protoyogi does not arises. Again when we assert 'A is not in B', we mean that there is an absence of B in A. So, in order to have such cognition we must have the awareness of B previously. That is, every negative judgment implies the cognition of locus for the absence that is asserted. But it seems that this rule does not hold in case of negative existentials, for when we assert 'A does not exist', we do not refer to any locus. But even an existential judgment can be expressed in a predicative judgment. For eg. when we assert, 'the hare's horn des not exist', we mean actually that the hare has no horn where the hare becomes the locus of the absence. Again when we say, 'the mermaid does not exist', we mean that there is an absence of mermaid in the reality and thus reality becomes the locus of such absence. However, in the judgment 'A is not in B' three conditions are required- the awareness of'absence of A', the awareness of'in' and the awareness of 'B'.

Now the question is how can a non-cognition of protiyogin and the perception of the locus yield a cognition of the absence of protiyogin in the locus? In reply it can be said that here the non-cognition must be 'yogyo' one. That one is yogyo which is perceptible in the presence of all the necessary conditions of perception. According to Naiyayikas, the reference of the absence of the negatum to the locus is intelligible if we admit a positive perception of the absence of the negatum in the locus. That is, when one is aware that the book is not on the table, he is sure that he is seeing the absence of the book on the table quite as much as he is seeing the table. Here the absence qualifies the table and this qualified table is quite definitely seen. So, according to this view, the means of knowing absence is perception. They do not admit that 'seeing the absence of the book' is nothing but 'failing to see the presence of the book'. They would say rather that the perception of the absence has for one of its conditions the non-perception of the book.

The perception theory has been rejected both by Prabhakara and by Bhatta-Mimamsakas. As Prabhakara does not admit the objective facthood of absence, there is no question of perception of absence. On the other hand, though the Bhatta-Mimamsakas admit the objective facthood of absence, they attack the perception theory. According to them, perception can be possible only between the sense-organ and the object-sensed. In seeing a flower there is a contact relation between the eyes and the flower. No such contact is possible between my eyes and the absence of, say, a book. Neither the relation of inherence can be supposed between the absence and the sense-organ. They would admit non-apprehension as the means of knowing absence, i.e., that, of which there is an absence, is capable of being apprehended in its presence (upalabdhiyogyo), but in its absence we do not have the apprehension of it.

But the Naiyayikas do not admit this apprehension theory. If, for e.g., there is a presence of a jar along with the absence of a table remain on the ground and if we can perceive the jar, then why is it impossible for us to perceive the absence of the table on the same locus? Here the absence has the

yogyota as much as the jar has. They have given sufficient justification in support of their view which we are not discussing now.

The epistemological discussion of negation is closely related with the logical discussion of it . As negation is expressed by the negative judgment , what will be the form of it?— this is the question with which logic deals.

Negation From Logical Perspective

Logic mainly deals with proposition. The proposition in general has been interpreted in different ways by different philosophers. In traditional logic we find the term 'judgment'. Frege terms the proposition as 'thought'. Quine does not admit propositions, he admits 'sentence' instead. Strawson draws adistinction between 'sentence' and 'statement'. This statement is the near analogue of proposition.

The logical discussion of negation is concerned with the question that to which the operation of negation can be related? Is it related to the predicate term or to the copula or to the sentence as a whole?

According to Rapheal Demos, negation can be taken as the qualification of the predicate term. Hence the proposition 'This is not red' should be read as 'This is not-red' or 'This is non-red'. But Russell does not agree with such interpretation. He believes that 'not' is an operator for negating the entire proposition. So, the structure of 'This is not red' becomes 'Not (this is red)'. Russell's argument becomes more prominent if we analyse his famous example of King of France. If we take the proposition 'The King of France is not bald' as 'The King of France is not-bald', then the proposition would be false since there is no present King of France. The proposition 'The King of France is not-bald' seems to state that there is someone who is King of France and who is not bald which makes the proposition false. Thus, negation must refer to the whole proposition.

In traditional logic the proposition is of subject-predicate form. For e.g., 'all trees are green', 'no men are perfect', 'some men are wise' and so on. So, there the negation is term-negation. The difference between the propositions, say, 'Some men are wise' and ' Some men are not wise' is due to the presence of 'not' before the predicate term in the second proposition. Thus we find the theory of opposition of proposition in traditional logic which is based on the term-negation.

In modern logic this term negation is completely rejected. In this concern we can mention the view of P. F, Strawson. There it is said that the basis of logic is sentence and their relationship. The relationship among the sentences is based on truth-value. That is to say that the criteria on the basis of which the division of the logical proposition is possible is the truth-value. Now, the truth-value belongs to the sentence, not to the term. That is, we never say whether a term, for e.g., 'table' is true or false , rather, we say whether the assertion about the 'table' or the proposition regarding 'table' true or false. If this holds then a difficulty arises in the traditional square of opposition where all the relationships among the categorical propositions are based on term-negation. If the sentential negation is admitted then the relation of contrary, alternation and sub-alternation are rejected, only contradictory relation holds. Thus in modern logic only contradictary relation between the propositions is admitted.

Another consequence of sentential negation is, which was regarded as simple proposition will be turned into compound one. For e.g., the simple proposition 'snow is not black' becomes 'it is not the case that snow is black' which is a compound proposition. So, there remains only two kinds of proposition - elementary proposition and compound proposition.

FURTHER READINGS

Bradley, F. H.	Principles of logic
Bhattacharya, G.	Essays In Analytic Philosophy
Spoor, K.	Negative Facts
Bertrand, R.	An Inquiry Into Meaning And Truth
	Human Knowledge

GANDHIJI— THE JOURNALIST

Arnab Kumar Banerjee* and Supriyo Hazra**

Last October 2, assumed significance as the country observed the 145th birth anniversary of Indian freedom fighter Mahatma Gandhi. Known as the 'Father of the Nation', Gandhiji's role in shaping up the Indian society and his contributions in establishing an Independent India is unparallelled. This year, Gandhiji's birthday also witnessed the newly elected Indian Prime Minister Narendra Modi launch the Swachh Bharat Abhiyaan.

The Indian government on Oct 2 issued a statement in its Press Information Bureau (PIB) where it said: "The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today exhorted people to fulfil Mahatma Gandhi's vision of Clean India. Launching the Swachh Bharat Abhiyaan at Rajpath in New Delhi, the Prime Minister paid homage to two great sons of Mother India, Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri, on their birth anniversary. He recalled how the nation's farmers had responded to Shri Shastri's call of "Jai Jawan, Jai Kisan," and made India self-sufficient in food security. He said that out of Gandhiji's two dreams— Quit India, and Clean India, the people had helped to ensure that the first became a reality. However, the second dream— Clean India— still remained unfulfilled. The Prime Minister said it was our social responsibility as citizens of India to help fulfil Gandhiji's vision of Clean India, by his 150th birth anniversary in 2019.The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today exhorted people to fill til Mahatma Gandhi's vision of Clean India, "[1]

With the Indian government launching its major plan on the occasion of Gandhiji's birthday and even expecting the nation to work hard to give the Indian freedom fighter a reality of the vision he had once seen of framing a "Clean India' by his 150th birthday five years later, it is time to look back and see into some of the major contributions he had made in some specific sectors.

This write-up will not look into the contributions of Gandhiji as a freedom fighter rather it will focus more on his journalistic contributions to the Indian society and his remarkable ability as a communicator which had unified India and hence played a major role in gaining freedom from the tyrannical British rule that had oppressed the Indian voice for around 200 years. Gandhiji's role as a communicator and journalist needs a better study this year as it was 110 years ago when this man from Gujarat had taken over in 1904 the editorship oi'the Indian Opinion and published the newspaper in English, Tamil and Gujrati, sometimes running the press himself. This piece will hence attempt to look into a different aspect of an India journalist whose contribution to the world of Indian journalism was immense.

On 2 October, 1869, Mohandas Karamchand Gandhi popularly known as Mahatma Gandhi was born in Porbandar, Gujarat. Mohandas or Mohan was the youngest of the three sons of Putlibai and Karamchand Gandhi. He was born in a middle class family. Bapu's mother Putlibai was gentle and

* Assistant Professor, Department of Journalism & Mass Communication, Vijaygarh Jyotish Ray College, Kolkata
** Research Scholar, West Bengal State University, Barasat, North 24 Parganas

devout which left a deep impress on his mind. Gandhiji was seven when his family moved to Rajkot, another state in Kathiawar, where his father, Karamchand Gandhi became Dewan (Prime Minister). In Rajkot, he attended a primary school and later joined a high school. Though conscientious he was a "mediocre student" and was excessively shy and timid. After the high school, Mohandas joined the Samaldas College in Bhavnagar where he found the course difficult and the atmosphere uncongenial. He lost his father in 1885. A friend of the family suggested that young Gandhiji should go to England and study law. Gandhiji jumped at the idea. The mother's objection to his going abroad was overcome by the young Gandhiji's solemn vow not to touch wine, women and meat.

When Gandhiji went to Bombay to take the boat for England, people of his caste: who looked upon crossing the ocean as contamination, threatened to excommunicate him if he persisted in going abroad. But Gandhiji was adamant and was thus formally excommunicated by his caste.Undeterred, he sailed on September 4, 1888. for Southampton at the age of eighteen.The first few days in London were miserable for Bapu. Towards the end of his second year, he came across two Theosophist brothers who introduced him to Sir Edwin Arnold's translation in English verse of the Bhagavad Gita. Having finished his studies in England, Gandhiji spent some time in Rajkot but he decided to set up a legal practice in Bombay, However, after having failed to establish himself, Gandhiji returned to Rajkot. South Africa was a turning point in Gandhiji's life. It confronted him with many unusual experiences and challenges, and profoundly transformed Bapu's life. Gandhiji had arrived in Durban in 1893 to serve as legal counsel to the merchant Dada Abdulla. Bapu's work in South Africa dramatically changed him entirely, as he faced the discrimination commonly directed at black South Africans and Indians. One day in the court in Durban, the Magistrate asked him to remove his turban, Gandhiji refused and left the court. On 31st May 1893, Gandhiji was on his way to Pretoria, a white man objected to his presence in a first-class carriage, and he was ordered to move to the van compartment at the end of the train. Gandhiji, who had a first-class ticket, refused, and was therefore thrown off the train at Pietermaritzburg.

Shivering through the winter night in the waiting room of the station, Bapu made the momentous decision to stay on in South Africa and fight the racial discrimination against Indians and others. Out of that struggle emerged his unique version of non-violent resistance, "Satyagraha". Today, a bronze statue of Gandhiji stands on Church Street, in the city centre.[2]

Away from being a fighter who fought for the freedom of the country from the hands of the British, his contribution as a journalist was immense. Staying away from India, Gandhiji's activities as a journalist commenced in South Africa. The brilliance of his journalism, urge for working for people and the motivation for serving the nation forced him to publish few other news papers over the years.

His first paper, Indian Opinion was started in South Africa. In order to ventilate the grievances of Indians and mobilize public opinion in their favor, Gandhiji started writing and giving interviews to newspapers. He focused on Open Letters and letters to the Editor, but soon realized that occasional writings and the hospitality of newspapers were inadequate for the political campaign he had launched. He needed a mouthpiece to reach out to the people: so in June 1903 he launched Indian Opinion. It served the purpose of a weekly newsletter which disseminated the news of the week

among the Indian community. It became an important instrument of education. Through the columns of the newspaper Gandhiji tried to educate the readers about sanitation, self-discipline and good citizenship.

The Indian Opinion was published in four languages-English, Gujrati, Tamil and Hindi. During the first year of its publication, Gandhiji's legal practice in Durham helped him rescue the paper from bankruptcy. Friends in South Africa and India also helped. A German architect provided the facilities of his large farm free for establishing the printing press. Gandhiji used the columns of the paper for publishing the English version of his booklet, Hind Swaraj, and for communicating his religious, social and economic views to fellow Indians in South Africa.[3]

Mahatma Gandhi once said: "So long as it (Indian Opinion) was under my control, the changes in the journal were indicative of the changes in my life. The Indian Opinion in those days, like the Young India and Navajivan of today was a mirror of part of my life."[4]

At the time of launching the Satyagraha in Ahmedabad, he gave this advice to his readers: "Please read , copy, and circulate among friends; and also request them to copy and circulate. Price: Price Pice."[5]

A notice to the subscribers of Young India, started on October 8. 1919, reveals the actual situation of the newspaper publication by freedom fighters and the opponents of the British government. Gandhiji wrote: This paper has not been registered according lo the law. So there can be no annual subscription. Nor can it be guaranteed that the paper will be published without interruption. The editor is liable at any moment to be arrested by the Government and it is impossible to ensure continuity of publications until India is in the happy position of supplying editors enough to take the place of those arrested. We shall leave no stone unturned to secure the ceaseless succession of editors."[6]

Most newspapers in those days could not last for more than a few months. And many patriotic editors had to undergo jail terms in addition to paying fines. They had to publish and perish, but phoenix-like they came back to life, not necessarily in the same spot or through the same press. Many a freedom-loving editor had to receive the "hospitality of His Majesty's hotels," the phrase used by Gandhiji in reference to British prisons.[7]

Gandhiji's motto that the "Sole aim of journalism should be service" inspired many patriotic editors who reproduced his articles from Young India and from Harijan, a bilingual newspaper in Hindi and English which he started on February 11, 1933.[8]

J Natarajan in his book History of Indian Journalism wrote, "Young India founded by the Home Rule Leaguers of Bombay with Shri Jamnadas as editor, immediately after the deportation of Benmjamm Guy Horniman, editor of the Bombay Chronicle, not long after it was started, Gandhi took over the editorship (October 8, 1919) of Young India as also the editorship of the Navjivan which he converted from Gujrati monthly into a weekly. From 1922 to 1924, when Gandhi was in jail, the two papers were edited by Shri C Rajagopalachari, Shri Jairamdas Daulatram and George Joseph. Young India ceased publication for a time when the Swaraj Party was in power but Gandhi started the Harijan movement soon after under the editorship of Mahadcv Desai though most of the contributions came from his own pen.[9](Pg 183)

Anne Besant favoured the total repeal of the Newspaper (Incitement to Offences)Act of 1908 as well as Indian Press Act of 1910 and was of the opinion that press and Registration of Books Act

should be amended to require a declaration by the editor. She was of the view that newspapers guilty of incitement to violence and sedition should be dealt with under the ordinary law after a judicial trial. She was a strong critic of direct action and of Gandhi's writings in Young India.[10]

Already mentioned above, this newspaper was equally significant as far as Gandhiji's contribution in the world of Journalism is concerned. Specially it was concerned with the development and improvement of a particular community which is deprived and was looked down by the society in general. The paper also talked about villagers and villages of this Asian nation which is currently the world's largest democracy. The needs of those people, their aspirations were voiced in the paper. Gandhiji played the role of a leader in highlighting the troubles these men faced and hence helping in a greater way to make the future generations feel about the hardships of the people. Law reforms and facilities introduced by governments for villagers, people from the special communities indeed took today's shape due to the fight started by Gandhiji in his own ways and other social thinkers of that period. And just like today, media (newspaper in this case) was the best means of reaching out to a great mass as well as make them think about the troubles and hardships faced by a section of the population who were not alien to them. Rather, they were part of the same soil in which they were born.

This newspaper was published under the auspices of the Servants of Untouchables Society formed by Gandhiji. About its name, he wrote in its February 25, 1933 issue: "Harijan means a man of God. All the religions of the world describe God pre-eminently as the Friend of the friendless, helper of the helpless and Protector of the weak. The rest of the world apart, who in India can be more friendless, helpless or weaker than the forty million (in the 1930s) or more Hindus who are classified as untouchables?"[11]

Harijan was different from previous newspapers in that it eschewed politics. It was solely devoted to the uplift of the Harijans and the villages. Its columns carried details of the village reconstruction work undertaken by Gandhiji and his followers, In addition to ahimsa, satyagraha, swadeshi and sarvodaya, it dealt with village sanitation, drinking water supply, health and hygiene, cottage industries, the need for looking upon the cow as the best economic resource for the villager, and the urgency in the effecting prohibition of alcohol and drugs.[12]

More than other Gandhian newspapers Harijan was a "views" papers, Gandhiji explained in its columns the essential difference between a newspaper and a "views" paper. According to him, a "views" paper is not for amusement but for instruction and regulating conduct. They (the readers) literally take their weekly lessons in nonviolence through its columns.[13]

Vir Bala Aggarwal and VS Gupta in their book Handbook of Journalism and Mass Communication wrote: "The two journals Young India and Navajivan were used by him to ventilate his views and to educate the public on satyagraha. In 1933, Gandhiji started Harijan,Harijanbandhu and Harijansevak in English, Gujrati, and Hindi, respectively. These newspapers were the vehicles of his crusade against untouchability and poverty in rural areas. These papers published no advertisements even then they enjoyed wide circulation. His note of defiance and sacrifice gave a new stimulus to the evolution of Press as a weapon of satyagraha."[14]

His articles were often circulated by the news agencies to the daily press for publication simultaneously or the day after. His clear and simple style, direct and free from all flourishes, gave Gujrati a strength and vividness of expression which was a valuable contribution to the development of the language.[15]

Gandhi, nevertheless, exerted a powerful influence on the editors of newspapers and he frequently exhorted them to express their views fearlessly without necessarily supporting his views or the policies of the Congress.[16]

For Gandhiji journalism was not a profession or a means of earning livelihood. It was a medium for him to serve humanity.

In his Autobiography, he had said. "The sole aim of journalism should be service. The newspaper is a great power, but just as an unchallenged torrent of water submerges whole countrysides and devastates crops, even so an uncontrolled pen serves but to destroy. If the control is from without (outside), it proves more poisonous then want of control. It can be profitable only when exercised from within. If this line of reasoning is correct, how many journals of the world would stand the test? But who should stop those which are useless? And who should be the judge? The useful and the useless must, like good and evil go on together, and man must make his choice."[17]

The freedom fighter, who is respected not only in India but also by foreigners across the globe, believed that newspaper was a social institution. He believed that the success of the newspaper depended on the extent to which it was able to successfully educate people.

It was not only his written words that had a greater impact on its audience, Gandhiji also used his oral communication effectively to reach his message to millions of Indians who were passing through the phase of British Rule in India.

There are not many examples m human history where one single person could reach so many tens or thousands or even millions using oral communication. There was no technical support to his oral communication during most of his lifetime since the public address system was not available in the early decades of his public service. He had to rely on a strong network of interpersonal and small-group communication methods.[18]

Wherever he went, whoever he addressed, he could transmit his credibility, honesty, sincerity and genuine interest in his fellow beings. That is why his small but firm voice could go straight to the hearts of his listeners.'Whatever he said was logical, unambiguous, clear to the point. Many people have described him as the spokesman for the conscience of humanity.[19]

Mahatma Gandhi employed three methods for oral communication. One was the Congress organisational network he had devised for carrying his messages to all parts of India. The other two were padyatras and regular prayer meetings. Many people did not understand the tremendous achievements one can make through oral communication, even when the communicator is not the sort of speaker who moves masses through forceful utterances and non-verbal strategies.[20]

Gandhiji could generate confidence by his communication and interaction because of the strength of his sincerity, his total commitment and personal example. He worked towards the blending of his message and his life through a rigorous disciplining of his body and mind. He spoke with conviction and his listeners could easily absorb his ideas. There was an emotional appeal in his speeches but he

spoke with the authority, like a sage or seer. He would speak on any issue only after gaining a thorough understanding of it and after formulating his opinion on firm grounds. His training as a lawyer and his practice of law probably helped him in this. But unlike many lawyer, he was willing to admit his mistakes when he was convinced of his errors. Through this unique blend of speech and action he could win hearts of the people. He did not hurt the feelings even of his opponents through biting sarcasm or violent vocabulary. But his words were firm and carefully spoken not through reverberating rhetoric but through directly entertaining the innermost recesses of his listeners" hearts. There were no 'ifs' and 'buts' in his flow throughout. Everything was well thought out before he spoke.[20]

Simplicity and frugality were the natural qualities of this communicator, The reason was not far to seek; he wanted to live like the poorest of the poor and experience the hardships suffered by the poor of his country. Another major factor to be considered when we evaluate Gandhiji as a communicator is his religion Organised religion had already become a handmaiden of 19th century capitalism. Without understanding his religious views, one cannot understand his communication strategies. There was opposition to his using the religious idiom and his bringing the force of religion into politics an economics. The critics based their arguments on secularism. But he had pointed out that all the secular constitution of the world were influenced by the humanitarian elements found in religions. The spirit of true religion is, according to Gandhiji, at the base of all 'secular' systems.[21]

According to Gandhiji, the foundation of Indian culture is religion, and culture and politics are almost synonymous with religion. However, his religion transcended dogma. Like Tolstoy an Vivekananda, Gandhiji believed thai religion should be based on service to humanity and not on particular dogmas.His religion of service was that of service to the poor; it was directed against the misery, ill-health, ignorance, unemployment and superstitions of the large majority of Indians.He did not consider poverty as divinely ordained, but as man made. He believed that a restructuring of society in a non-violent way would remove poverty and misery.[22]

The entire paper aimed at remembering Gandhiji's contribution to the world of journalism. He was a freedom fighter whose work as a social reformer was indeed strong and mentioned over and over again across the world. But, when the country is once again looking back to the education he had imparted to the nation, it is time to look back to a sector where the leader had played an important role in developing it in this third world nation. His works were more for the betterment of people and developing the nation than earning money from it. It was for public good that Gandhiji had worked on his papers and this puts him in a significant place in the paradigm of world journalism.

FURTHER READINGS

Press Information Bureau website 19.10.2014

http://india.gov.in/ 19.10.2014

Vilanilam, J. V., Growth and Development of Mass Communication in India– National Book Trust, India.

Gandhi, M. K. 1950. Satyagraha in South Africa, Ahmedabad.. Navajivan Publishing House.

Bhattacharya, S. N. 1965. Mahatma Gandhi, The Journalist, Bombay, Asia Publishing House.

Ibid

Natarajan, J., History of Indian Jornalism— Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.

ibid

Aggarwal, V. B. and Gupta, V. S., Handbook of Journalism-Concept Publishing Company.

Gandhi, M. K. 1958. An Autobiography: My Experiments with Truth, Ahmedabad, Navajivan Publications.

ibid

ibid

BIBLIOGRAPHY

Kumar K. J., Mass Communication in India— Jaico Publishing House

Aggarwal, V. B. and Gupta, V. S., Handbook of Journalism & Mass Communication— Concept Publishing Company

Ghosh, S., Mass Communication An Indian Perspective-Sahitya Samsad

Aggarwal, V. B., Essentials of Practical Journalism- Concept Publishing Company

Kamath, M. V., Professional Journal ism-Vikas Publishing House Pvt Ltd

Basu, A. and Dhar S., The Reporler a handbook of every journalist— Alchemy

Mehta, D. S., Mass Communication and Journalism in India-Allied Publishers Private Limited

Friend, C. and Singer, J. B., Online Journalism Ethics Traditions and Transitions-PHI Learning Private Limited

Ahuja, B. N., Theory and Practice of Journalism-Surjeet Publications

Vilanilam, J. V., Growth and Development of Mass Communication in India— National Book Trust, India

Bhattacharya, S. N., Mahatma Gandhi, the Journalist, Bombay, Asia Publishing House

Natarajan, J., History of Indian Jornalism-Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

FROM 'HARIYALI' TO 'HOOL' CHANGING PROFILE OF THE JUNGLE MAHAL SANTALS

Aparajita Bhattacharyya*

The tribal struggles against alien people have formed an interesting subject for the historians of Colonial Bengal. From the very early period of colonial intrusion the tribal people of eastern India tried to resist the British force. Historians have analysed these resistance movements in the light of socio-cultural and politico-economic factors. Very recently with the introduction of ecological and environmental historiography, the tribal struggles are being analysed from a different point of view. Following this recent trend this essay will try to approach the struggle of the Santal population of Jungle Mahal region from an environmental aspect. For doing so, this essay will first discuss the geo-physical features of this area very briefly. Then the Santal practices and life style will be analysed, followed by the impact of colonial policies on them. And lastly we will try to relate their resistance movement with the environmental problems they faced.

Lying on the western boundary of Midnapore, the Jungle Mahals also covered forest tracts of Bankura, Birbhum, part of Mayurbhanj State in Orissa and the Singbhum and Manbhum districts of Chhota Nagpur. It was undulating and picturesque, with large tracts covered with extensive jungle. The lateritic soil, however, was arid and scarcely anywhere deep, many tracts being unproductive and almost uninhabited[1]. In the northwest, a low ridge rose rather suddenly from the lateritic plain. To the west of the ridge, there is a group of hills of irregular shape, which had no general bearing, but occurred rather in isolated masses separated by valleys. The climate of these arid stretches was being characterised by a fierce dry heat in the hot weather, a short cold weather and a moderate rainfall, the average rate being 58.68 inches annually[2]. Shilabati and Subarnarekha are the two rivers that flow in the Jungle Mahals. These rivers, although provided an easy means of communication, could help little in irrigational works.

The forestry here assumes the character of a mixed forest, predominated by Sal, Mahua and Palas vegetation. The jungle products consisted of lac, tusser cocoons, wax, resin, dhutura, firewood and various jungle roots. The animals found here are tigers, leopards, bears, hyenas, foxes, jackals, jungle cats, sambar, spotted deer, barking deer, ravine deer, wild pigs, migrating elephants from Mayurbhanj are occasionally seen. Venomous snakes like Cobra, Karait and non-venomous like Python, Dhaman etc. are found here in plenty.

Due to absence of enough cultivable land, Jungle Mahals was always scarcely populated. Majority of the inhabitants were aboriginal tribes. The tribes met here with the Bhars, Bhumijs, Gonds, Santals, Kharias, Kharwars, Kols, Nats, Puraons, Sabars and Dhangars or Uraons. Of all these tribes, the Bhumijs and the Santals formed the bulk of the population. According to 1872 census report, the Santals numbered 96,921 out of the total 1,39,018 aborigines of the area.

* Assistant Professor, Department of History, Vivekananda College, Thakurpukur, Kolkata-63

The Santals, who were the largest community among the aborigines, were a hardy and prolific race. The date of their settlement in this area was unknown. Their traditions relate that they came to Saont, the modern Silda Pargana, in the course of their wanderings several centuries ago[3]. Walter Hamilton found that the Santals were despised by the inhabitants of the plain country, as low castes. The Zamindars gave them no leases. But these tribals were "mild, sober, industrious people and remarkable for sincerity and good faith"[4].

The Santal villages were situated between the cultivated plains and the thick jungles in order that they might protect the crops from deer and wild animals. Sometimes they tilled land with considerable success and raised good crop of rice and kalai. The language of the Santals belonged to the Mundari group of languages. The tribe was divided into eleven exogamous totemic clans[5]. Both clans and sub-clans were patri-lineal[6]. Edward Duyker supports the view of Vijay Kochar that the Santal integrity group and identity was maintained by common cultural traditions, tribal sentiments and awareness of kind[7].

Cultivated fields were important to the Santal villages but forest was even dearer to their hearts. Their relationship with forests was economic, social and cultural. The forest supplied the villagers with twigs and branches for fuel, timber for rafter and tools and leaves for making utensils[8]. If the year was bad, the forest was scoured for roots, leaves and berries and certain plants were also cooked. These plants were an insurance against famine. But above all the forest was a place of secret recreation[9]. In it, men could discuss their tribal ways in privacy and could hunt. The greatest occasion for the Santal men was the annual hunt in the forest. The old women used to instruct the young girls in family matters in secret in the forest.

Strongly animistic, the Santals believed that they were surrounded by a world of Bongas or spirits for the appeasement of whom they evolved a complex set of rituals. Just outside the Santal village a remnant of the original forest was jealously preserved, as a jaher or sacred grove. Within its circle, three sal trees in a line were dedicated to *Maran Buru* [the great mountain], *Mareko Turuiko* [the five six] and *Jaher Era* [the lady of the grove]. The Mountain communes with the Creator at man's birth; clothes him, And teaches him to produce the first comforts of life[10]. Jaher Era or Jaher Buru was worshipped with offerings of goat, fowls, rice and ghee at *Sarhul* festival in the months of Baisakh and Falgun. She was supposed to be capable of blasting the crops if not duly propitiated and worship was necessary preliminary to the commencement of the agricultural operations[11]. A Mahua tree was reserved a fourth bonga, *Gosae Era*, a lonely figure stationed a little distance apart[12]. Thus jaher served as a temple or religious place of Santal deities, which were mainly different aspects of nature.

The festivals of the Santals were very closely related to nature. *Jonthar* was a festival connected with the first fruitation of trees. *Sahrae* was to celebrate the "harvest home", a period of relaxation, in late December or January. *Mag* was a festival related to the cutting of thatching grass. Most colourful was the *Baha* festival performed in the month of March. This was celebrated before any fresh flowers were worn or Mahua flowers picked up for consumption[13].

The tribal myths also represented a very close relationship with the nature. The myths show that all living realities were inter-related, inter connected and inter dependent. They uncover a vision of an inseparable interaction of the living and non-living environment. The myths symbolically tell that

the existence of the humans could not have been possible without the help of animals. That is why the tribals never claimed an absolute right and power over other creations. The myths represented the land as the mother and it nourished all living beings and was the symbol of unity of all life. Thus the land was the basis of inter-relationship of all living beings and it was the place, which gave identity to the community[14].

The polity of the Santal community was represented through community council or village chiefs. The traditional village council operated under a pargana, or council comprised of 10 to 12 village panchayets. The final authority rested with the *Lo Bir* or forest council, which was the final court for dispute arbitration[15]. The annual hunt organised by the Lo Bir provided the basis for inter-village political organisation and joint decision-making. More specifically, the Lo Bir provided a unifying mechanism among dispersed Santal communities both over space and time. It adopted devices to sustain the settlements, controlled and regulated access to village resources of different kinds and stability of agriculture much depended on its cohesion[16].

In every Santal village *Mandal* or *Manjhi* [the head man] was a functionary of central importance. He was the representative of the village to the outside world. The post of a Mandal was usually hereditary. He was responsible for the rent of his area. In each large village, or in each group of two to five small villages, there was a barua, a chowkidar, a chetyal and a deluria to help the Mandal in carrying out village administration[17]. The headman for himself retained a certain portion of land, which was free of rent by virtue of his position. Although he was responsible for the joint rent of the village, he also became a co-ryot with the villagers and in no sense occupied the position of a tenure holder over them.

The community control of the unoccupied forestland was a unique feature of Santal village system. But communal control did not mean that the society of the Santals was an egalitarian one. Right exercised over forest differed according to social position and Mandal or others enjoyed some degree of privilege. The Santals carried on trade in various forest products like firewood, deer and buffalo horns, wax, honey, bark fabric, lac, silk worms, tusser cocoons, herbal medicines and charcoal. The Banjaras had established links with certain forest tribes leading to barter trade in certain forest products[18].

Tribal communities enjoyed certain customary and hereditary rights in the jungles. For example they were never charged any tax for cutting woods or for hunting. They alternatively protected their political autonomy and forest resources through warfare and withdrawal from all connection with the outer world. When the forest dwellers encountered least oppression from rulers or locally powerful groups, they fled into the forest. Their superior knowledge of the jungle and their hunting skills made them an effective guerrilla force.

The state power in the pre-colonial period allowed these aborigines to retain their primitive lifestyle. Since the introduction of iron in India, people had carved the cultivated arable of the plains, valleys and hills out of the woodland. In turn the jungles had retreated in the face of hoe and plough. There is considerable body of evidence to suggest the absence of an ecological equilibrium in pre-colonial India. Forest fires were important to create pastures as well. Hunting by state nobility and the tribal people decreased the number of animals living in the forest. But as a result of all these the

boundaries of the forest shifted. The core areas of the jungle remained intact maintaining the ecological balance of the area. The tribal people, though considered strange and dangerous, were taken for granted as part of the hills and forests and more or less frictionless coexistence was possible. The forest resources were not exhausted in a concerning way as the society was essentially subsistence oriented. The intervention of state power in the Jungle Mahals was no different from these basic ideas and policies. Although formally the Jungle Mahals came under the Mughal sway, no attempt was made to exercise direct political authority in that region[19]. All these helped the Santals of this region to continue their ethnological practices and maintain their identity for hundreds of years without remarkable change.

Professor B.B.Chaudhuri found, by about the beginning of British rule the foundation of Santal economy was largely settled agriculture. Shifts in cultivation did occur, where relative infertility of the soil made fallowing of land unavoidable. However, the usual ecological and other conditions prevailing here greatly impeded growth of cultivation. Forest product, used as food, fuel and medicines, had also a vital place in the economy. Labour in the neighbouring and even in the remote peasant villages during sowing and harvesting times, was also an important source of income[20].

These forest people faced a serious challenge with the introduction of colonial rule in the area. So far the controlling persons of mainstream politics allowed the tribal people to maintain their lifestyle unchanged. But the alien colonial rulers were aimed to exert a direct control over this area as well as on the inhabitants. In order to understand this departure we have to keep in mind the nature of the European impact on India. Europe's contact with India was a result of Europe's expansion of geographical knowledge. Industrial Revolution enormously enlarged the possibilities of transforming resources from one form to another, and of transporting them over large distances[21]. With these technological advances, a great range of objects became commodities, which prompted an outflow of a much greater range of resources from both cultivated land, and over a period of several century forests and other natural resources, controlled and used by local peasant communities were converted into the property of landlords and the state. At the ideological level too, the private and state property was being upheld, and validity of communal control was being questioned[22].

Three aspects of this revolution are important for our understanding of the change that took place after colonial intervention. First, the importance of production and transformation of resources for subsistence was replaced by production and transformation of resources for commercial use. Secondly, in its wake came the breakdown of cohesive local communities, and human societies became atomized, with individuals acting largely on their own[23]. Thirdly, the capacity of individuals to command access to resources was at a premium and markets became the focal point for organizing access to resources. These three characteristics of the industrial mode of resource use (i.e. resources as commodities, breakdown of community and emergence of market) are central to a proper understanding of the ecological encounter between India and Britain[24]. This was clash of cultures, of ways of life.

From the last decades of Seventeenth Century the cutting of forests and cultivation of wastelands were considered to be a sign of progress. The British had a deep ideological animosity towards uncultivated land. Throughout the seventeenth and eighteenth centuries the forest dwellers in England were locked in struggles with crown officials and big landlords over control of the woodlands. From

around the 1750's English landowners planted trees on privately owned and enclosed lands, which were to be cut and grown on a regular basis like crops[25].

In India, as in other colonies, the British rulers hoped to consolidate their authority by introducing extensive and enormously productive agricultural systems[26]. The new rulers gave the age-old Indian notions of conflict between farm and forest a new significance. They believed that jungles were lands that had lapsed into a stage of nature because of inadequate care by humans to clear wild vegetation. Pastoralists, who used forest as a grazing ground for cattle thus became an object of contempt. The extension of cultivable acreage was an index by which the British evaluated the success or failure of their policies. British power provided protection to merchants and colonist cultivators to accelerate their advance in these jungle tracts. Thus, the establishment of an alien rule meant not only a retreat of forest lines, but the new political context also led to a tilt against groups on the fringes of settled agriculture.

The major incentive to control and clear the forestlands of India came, however, from the strategic and commercial imperatives of a transcontinental Empire. With Oak forests vanishing in England, a permanent supply of durable timber was required for the Royal Navy as the safety of the empire depended on its naval forces[27]. The problems of obtaining adequate timber for ships led to the first steps for the control of the use of forests. The revenue orientation of Colonial land policy also worked towards the denudation of forests. As their removal added to the class of land assessed for revenue, forests were considered to be an obstruction to agriculture and consequently a bar to the prosperity of Empire[28]. This process greatly intensified in the early years of the building of the railway network after about the mid-1850s. Railway requirement were the first and by far the most formidable of forces thinning Indian forests[29]. It is against these transformations in Europe and India that we must view the changes introduced in the Jungle Mahals.

The populations of Jungle Mahals were described in early colonial records as "the most" unimprovable who, finding the old country is becoming too civilized for them, fly from the clearance they have made, hide themselves in the hill forests, and relapse into their condition as savages[30]. In Bengal the combination of "primitive" and illegible place offered evidence of stable polity. Thus, the company officials did not have any role model for administration of this area before them. The British soon discovered that the large western jungle tracts were in the hand of Zamindars who had paid little revenue since the Maratha incursions of the 1740s. Caught up in what was to become an incompatible vision of rule through Zamindars presiding over stable peasant communities, the political conquest of woodland Bengal continued over the next few years[31]. The forest chieftains and tribal communities resisted, ambushing British forces and harassing them whenever possible. Through superior force, however, the British gradually succeeded in establishing their control in this area.

But the formal conquest of the Jungle Mahals did not yield much dividend because there were no people to clear the wasteland and extend cultivation. People of the adjacent areas could not be influenced to settle in the Jungle Mahals. The reason for the reluctance of these people was that the area was not fit for cultivation. J. C. Price, gives an account of the area in following words— "even in 1800 nearly two thirds the district consisted of jungle, the greater part of which was uninhabited and inaccessible. Where it was otherwise, and the soil fit for culture, the want of water, the want of

bunds, the extreme disinclination of the lower order of the natives to settle in the Jungles and of the higher orders to engage in any undertaking attended with expense and risk for remote advantage seemed insuperable obstacles to any great progress in clearing the jungle[32]." Gaining a closer acquaintance with the forests through these frustrations, company officials realized much about alternate economic values that the forests might hold. By the 1790s the European traders traveling through the forests, occasionally mentioned of encountering teak, sal and sissoo forests, all Indian timbers by then widely recognized as commercially valuable[33]. By the turn of the century, it was becoming evident that one must look for economic advantages in the raw materials either actually available in the country or capable of being immediately produced by cultivation of soil.

Botanical surveys, tree plantation and timber conservancy were measures that entered the colonial repertoire for knowing and ordering the landscape. Where they occurred, persisted, failed or enlarged were all aspects that set colonialism off against the historical and geographical particularities of the area[34]. When landscapes were partitioned through colonial survey and policy, their inhabitants were also compartmentalized. Tribal places were made, not only by curbing practices like shifting cultivation but by assigning them a specific terrain which was designated the place of tribes unredeemable from "backward agriculture". Administrators, scientists and other imperial agents believed that a significant agreement existed between the primeval landscapes and their human inhabitants. Many hunting and gathering tribe's economic condition was bad enough for survival even in the period immediately before the colonial intervention. This position worsened in the colonial period when degradation of subsistence production was accompanied by their confinement to certain spaces through force or voluntary movement and settlement. The making of places, was a pacificator tactic that compelled a close observation of landscape use[35]. The imperial officers, in this case, found that although shifting cultivation was practiced, the villages generally contained groves of mango, peepul and other big trees and were surrounded by grassland and forests. It shows that trees and forestry were regarded as a big source of sustenance, even though agriculture was there.

The colonial policy of making tribal places distinguished the inhabitants of those places from Hindu cultivators. Thus, the aboriginal society was divided among the Hinduized and others and the former started to dominate the latter through service tenures and office. These people introduced rural hierarchy and they favoured Rajputs and Brahmins. The cumulative effect was the erosion of Manjhi authority, as the collective proprietary land system they presided over was dismantled.

The systematic redrawing of wild land boundaries was an essential procedure for effective land control in the Jungle Mahals. The extermination of wild animals through hunting, a process known as vermin eradication, was very popular in the western world. The spread of British control over general administration in forested areas gradually led to their assumption of vermin eradication role[36]. Another way of introducing order was the implementation of selective plantation schemes. In the Jungle Mahals, teak planting was undertaken to introduce both order and industry in wastelands. Plantations and farm forestry were expected to combine in transforming jungle limits of the arable into productive gardens and groves[37]. However, ecological forces precipitated the premature felling of the Jungle Mahal plantations.

Thus, the advent of the Colonial Rule in the Jungle Mahals brought changes in a number of ways. The process of forest clearing for agricultural land conversion allowed torrential rains to wash away the shallow top soils, leaving an exposed laterite hard pan that made farming virtually impossible in many areas. Soil erosion led to siltation of rivers. Traditional forest-based industries declined dramatically. In short, the forest tribes, whom the pre-colonial rulers always accepted as part of the forestry, were no longer treated so in the colonial period.

The forest people, however, were not ready to accept this alienation and from the very beginning they tried to resist the colonial advance. Whatever course the clash may take, it is always a hopeless struggle of the weak against the strong, the illiterate and uninformed against the organized power of a sophisticated system. Yet these tribals stood up again and again to avert the clutches of the British Rule.

The march of the East India Company forces from the late 1760s brought in a series of political disturbances. The Bhumij people in the Jungle Mahals offered armed resistance. Great disturbances were created in 1798-99 with the outbreak of the Chuar Revolt, in 1806 with the second Chuar uprising[38] and in 1832-33 with the outbreak of Bhumij Revolt. The warfare and the attempt of British troops to suppress the rebellions disrupted the socio-economic set up of the Jungle Mahals.

The depredations of the Bhumijs and the repression of the army left a combined and lasting mpact on the Santals. Characteristically, the Santals were very peace-loving people. They had developed a permanent attachment to land even when they did not get any permanent tenure-ship. When they were evicted, they went in search of a new land silently. The Bhumij revolt not only disturbed the growth of agriculture in Jungle Mahals, but also disturbed the Santal way of living. The disturbance deprived them of their means of subsistence. The landholders did not take any interest in the reclamation of jungle lands. The operation of the English army also did not spare the Santals. Their villages were burnt and cattle and crops destroyed[39]. This situation might have led to a large scale of migration of Santals from the Jungle Mahals to Damin-l-Koh. While in the Jungle Mahals there was not a single revenue free state, the settlers of Damin-l-Koh were given the opportunity to enjoy rent-free land for 3 to 5 years. But by the 1850s, the negligence of the Sahibs, the extortion of the Mahajans, the corruption of the Santals, outside contact and internal weakness ruined the Santal Mandali system. A great tension was building up affecting the Santal community as a whole and a seething discontent was gripping them. This culminated in the outburst of Santal Hool of 1855. Although the Rebellion started in the Damin-l-Koh region, it affected some parts of the Jungle Mahals.

Earlier the Santals of the Jungle Mahals had bought a new life to Damin, and now the inhabitants of the latter area ignited the flames of rebellion among the Santals of the Jungle Mahals. The Hool had spread over a wide area from Taldanga at the South-west of Birbhum and Sainthia at the Southeast, to Bhagalpur and Rajmahal. Birbhum, Bankura and Hazzaribag, which formed parts of the erstwhile Jungle Mahals, were affected by it[40]. The Revolt witnessed a rapid decline of their autonomous socio-economic institution, the Mandali System. Consequently, the Santals of the Jungle Mahals either turned into agricultural labourers or found subsistence in the neighboring coalfields.

The foregoing discussion shows how the Santal community of the Jungle Mahals region faced the

British intervention in the late 18th and early 19th centuries and then ultimately took up arms in 1855 against the colonial rulers. This clash between a primitive and a civilized community was indeed a political and socio-economic struggle. But this upheaval can also be explained from an ecological point of view. We have seen that the Santal belief system, religious practices, and day-to-day life were strongly grounded in their natural Surroundings. Protection of nature or forestry, therefore, meant protection of deities, of deep-rooted religious beliefs and of means of subsistence to these primitive people. In this way their struggle obviously had an ecological or environmental essence, as protection of nature was an important sentiment. They were not environmentally conscious in present European sense of the term. But every aspect of their life was connected with nature. Therefore, a loss of control and direct contact with nature meant loss of everything to them.

Thus we can conclude by saying that the loss of customary rights led to the frantic effort on the part of the Santal, to check alien rule. It is true that their struggle cannot be Characterized as a purely ecological one. However, if they are considered as part of the ecological cycle of the area, the ecological explanation becomes more direct. They played a very important role in maintaining the ecological balance of the area by killing animals of the Jungle Mahals in moderate scale. Only thing is that they were not overtly conscious about this fact. The ideologies of outsiders could not mobilize them till the first half of the nineteenth century. Had this contact been established earlier the Santal Rebellion might also have an ecological colour. Thus, after one hundred and sixty years of the event, we can say, that the 'Hool' of the Santals was undoubtedly an effort to save the 'Hariyali' of the area.

NOTES

1. W.W.Hunter, *A Statistical Account of Bengal vol-III*, Part-l (Midnapore), (London 1876, Reprint Calcutta, 1997) p.7
2. L.S.S O'Malley, *Bengal District Gazetteer Midnapore* (hereafter BDGM), Calcutta 1911, Reprint 1995) p.5
3. Ibid., p.20
4. W. Hamilton, Quoted in L.S.S. O'Malley, BDGM, p.70-71
5. Edward Duyker, *Tribal Guerrillas; The Santals of West Bengal & the Naxalite Movement*, (Delhi, 1987), pp.3-4
6. ibid., pp.3-4
7. ibid., p.3
8. W.G. Archer, *The Hill of Flutes; Life Love and Poetry in Tribal India*, p.20
9. ibid., p.24
10. W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal* (London 1868, Reprint Calcutta 1996), p. 103
11. H. H. Risley, *The Tribes & Castes of Bengal* Vol.-l (Calcutta 1891), p. 124
12. Archer, op.cit., p.26
13. ibid., p.30
14. A. Watilongchar, "Doing Creation Theology with Tribal Culture of India", in *Journal of Tribal Studies* (Vol.-iv, No. 1, January-June, 2000), p.57

15. Mark Poffenberger, "The Resurgence of Community Forest Management in the Jungle Mahals of West Bengal" in D. Arnold & R. Guha (eds) *Nature, Culture and Imperialism* (Delhi, 1995), p.341
16. B.B. Chaudhuri, *Peasant History of Late Pre-Colonial and Colonial India* [History of Science, Philosophy and Culture of Indian Civilization, Vol-VIII, Part-2] (Calcutta, 2008), p.712
17. O'Malley, op.cit., p.87
18. ibid., p.250
19. Swapan Dasgupta, "Adivasi Politics in Midnapore", in Ranajit Guha (ed) *Subaltern Studies*, Vol.-IV, (Delhi, 1985), pp.102-103
20. B.B. Chaudhuri, op.cit.
21. R. Guha & M. Gadgil, *This Fissured Land: An Ecological History of India*, (Delhi, 1992),p.114
22. ibid, p. 115
23. ibid.
24. ibid., p.116
25. Mahesh Rangarajan, "Imperial Agendas and India's Forests : The Early History of India's Forestry, 1800-1878" in *Indian Economic and Social History Review* (IESHR), Vol.-31, No. 2, April-June 1994, pp.147-167
26. Guha & Gadgil, op.cit, p.117
27. ibid., p.119
28. B. Ribbenthrop, *Forestry in British India*, (Calcutta 1900) p.60
29. Guha & Gadgil, op.cit, p.121
30. K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests : State Making & Environmental Change in Colonial Eastern India* (Delhi, 1999), p.34
31. ibid, p. 39
32. J.C. Price, *Notes on the History of Midnapore* (Calcutta 1876), p.34
33. Sivaramakrishnan, op.cit, p.40
34. ibid, p.80
35. ibid, p. 84
36. ibid, p. 91
37. ibid, p. 109
38. Binod Shankar Das, *Civil Rebellion in the Frontier Bengal*, (Delhi 1973), p. 104
39. West Bengal State Archives, Bengal Judicial Proceedings (Criminals) No. 23 of January 1, 1833
40. Suchibrata Sen, *The Santals of Jungle Mahals, An Agrarian History* 1793-1861,. (Calcutta, 1984), p. 103

ENTERING THE TRAP OF THE TEXT

Manidip Chakraborty*

Did you like the play *Chakrabyuho* (staged by the students of the department of English on Sept 17, 2014)? Now this single sentence is definitely going to give birth to a variety of reactions on the part of different readers. On the one hand there are those who were lucky enough to have watched the play ('lucky' more because they will be privileged to a great extent in better understanding this essay). On the other hand there are some who somehow could not be present on that particular day, but later got to know 'everything' about the play from 'others' (which is always already filtered through the consciousness of other people). But what about those who have no idea whatsoever regarding what the term *Chakrabyuho* refers to? The target audience, or better to use the phrase 'the implied reader' of this particular essay is this third category, since preconceived notions very often misguide the perceivers and the focal point of this essay is the different expectations aroused by a 'text' (a word which includes almost everything around us; anything that corresponds any kind of meaning).

The technique of beginning abruptly, without giving much account of the whereabouts of the characters, was made popular by the short story writers around the very end of the 19th century. Unlike novel it left much open for the reader's imagination; unlike tragedy it hardly made use of any choric technique; unlike epic it did not care much for beginning *in media res* and then once again going back- it simply presented to the reader a slice of life without being much attentive to formal, rational, cold information. It, perhaps for the first time, valued the expectation of the reader and his ability to fill up blanks. So, in a way, I must admit, I am employing that same technique in my non-fictional *text*, with an intention to play with the expectation of the reader.

A reader with a mind void of any kind of expectations, a *tabula rasa* so to speak, is nothing but a myth, since the very process of 'reading' is actually a continuous building up of expectations and their simultaneous fulfilment. The moment I inform someone that *Chakrabyuho* was more or less an adaptation of '*Macbeth*,' he/she will start forming his/her own preconceptions regarding the play (even someone who hears the term 'Macbeth' for the first time in life will start forming his/her own conception as for what the term suggests). In fact the very concept of adaptation makes use of the knowledge on the part of the reader/audience (a device which is known as 'subtext').

The subtext, or rather the original text, might be overtly referred to in the new text (as was done in *Chakrabyuho*) or the connection might be established by using myths and symbols (a technique which reached its climactic point of achievement in the hand of James Joyce). Now a film like *Maqbool* claims itself to be an adaptation of *Macbeth* only in its opening credits, otherwise there is no direct reference to the original text throughout the entire film. Then what is the point of re-making the old text time and again? This, on the other hand, is related to the concept of circulation of myths in all ages, but that is not our concern here. Modernism has taught us that it is practically impossible to create any *original* text anymore, since it would always end up becoming "a tissue of past

* Part-time Lecturer, Department of English, Vivekananda College, Thakurpukur, Kolkata-63

quotations" a concept popularized by Roland Barthes in his epoch making essay "The Death of the Author". It is therefore better to accept indebtedness to the source text, since self-reflexivity is the best self-defence against all charges regarding plagiarism.

Now the perceiver is curious to know how far the maker of the adaptation remains faithful to the original text, or rather deviates from it. A certain familiarity with the basic storyline also lets the perceiver detach himself/herself from the 'content' of the new text and analyse it rationally (a technique famously described by Bertolt Brecht as *V-effect* or *Alienation effect*). But the job is not done until the new text becomes a separate text in itself, an individual creation. This is where enters the perceiver without any biased outlook (or, to put it more brusquely, without any knowledge of the previous text whatsoever).

The interaction between the text and the reader is an exclusively subjective process. Everyone is entitled to create his/her own version of '*Macbeth*' since the author is dead (of course Shakespeare is dead, but here I mean- it is now for the reader and not the author to interpret the text). But even the adaptation of a text can have various sorts of impact on different individuals. I know someone who found it absolutely unnecessary to call the play *Chakrabyuho* since it happened to be a perfect observance of the original text, with a number of modifications perfectly justified. On the other hand, there is someone who felt it would be better to have discarded all direct associations with the Shakespearean play (for example, utterance of 3/4 sentences from the original text) in order to emphasise the 'Indianness' of the new text. For instance, Hecate being Indianised as Devi Sharpamosta was an interesting twist. There are many 'someones' who hold their own opinions regarding the play, but in any case, any kind of reaction on the part of the audience proves their active participation in the formation of the new 'text,' and it announces the success of the play.

I also have my own reading of the play (of course I do, after all, I am also a perceiver, but the paradox lies in the fact that the moment I start sharing my views, I also become the 'author,' after all this is MY essay and as an author I am not 'dead' yet). What really intrigued me is the way the concept of sexuality has been partially disrupted in the play. The audience found it really amusing during the announcement of the dramatis personae that the director (a 'he') is going to play the role of the Witch (although this was only natural during the age of Shakespeare). But the opening scene left everyone astounded. Despite the complex theoretical issues regarding individual ways of reacting to a text, I guarantee, everyone was chilled to the bones due to the sinister acting of the boy. Next shock came when two girls were seen playing the roles of Malcolm and Donalbain (in fact Donalbain confessing 'her' lust for women was particularly hilarious). Then came the two Murderers, once again two girls. There is nothing wrong with a lady doctor, but once again Macduff's daughter aspiring to be a *birpurush* reminds one that Lady Macbeth was not the only one to have denied her sex, and this renders things even more complex as far as sexuality is concerned.

Since we were talking about the Brechtian Alienation Effect, let us just move on to another aspect of the play. It was due to certain obvious reasons that the auditorium was not apt for the enactment of a play like *Macbeth* in which darkness becomes almost a recurrent motif. Around 3.00 p.m. in an exceptionally bright day, it had to be left for the imagination of the audience to make a night of a day. Moreover, removing dead bodies is always a problem (even in drama) and in this play the dead

ones had to take the trouble of leaving the stage in broad daylight after their respective scenes were over. *Hamlet*, in this respect, creates no such difficulty since almost the entire dramatis personae get killed at the end, and they have to stand up only for the sake of the curtain calls. But despite this unintended V-effect, as *Chakrabyuho* was nearing its end, the mysterious red hue, created by the setting sun, farther intensified the sinister atmosphere and made the audience forget everything about the technical inadequacies. No doubt a failure as far as the employment of the V-effect is concerned, but this is perhaps what we call *success*.

Now, since my desperate attempt to add a new angle to the study of Chakrabyuho is more or less over, the question that still persists is- did you like the play? It does not really matter. You may like it, you may not like it, you may have not even heard of it, but in any case the play has already been successful in leaving its impact on your psyche, it has ensured its permanent place in any kind of study regarding the adaptations of '*Macbeth*'- therein lies its success.

চিকি আর নদী' এবং 'বাঁশি',— চিনুয়া আচিবির ছোটদের লেখায় ছোট-বড় সম্পর্কঃ একটি নারীনিসর্গনীতিবাদী পাঠ

মৌপিয়া মুখোপাধ্যায়*

সমাজ সাধারণত বাচ্চাদের কি চোখে দেখে সে বিষয়ে ব্যারি থার্ন মনে করেন যে শৈশবের প্রকৃতি সম্পর্কিত সমসাময়িক চিন্তা ধারার তিনটে আলাদা মত রয়েছে। বড়দের সুরক্ষা ছায়ায়, বড়দের নিয়ন্ত্রণ, এবং বড়দের তত্ত্বাবধানে থাকবে শিশুরা। কারণ, তারা যথাক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক সমাজের অপরাধের শিকার, বিপজ্জনকভাবে সমাজের পক্ষে ভয়ানক, এবং প্রাপ্তবয়স্ক সমাজে শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করে। (স্কাই, পৃ ২০৪)। আলোচ্য কাহিনীগুলিতে কিভাবে সমাজের প্রচলিত ধারণা এবং নারীনিসর্গনীতিবাদী দর্শন উঠে এসেছে ছোটদের চরিত্র চিত্রায়ন এবং ছোট বড়র সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, সেই দিকটি দেখা হয়েছে। আর এই সম্পর্ক দেখতে গিয়ে অবধারিতভাবে পারিপার্শ্বিক এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কও বিশ্লেষিত হয়েছে। নারীনিসর্গনীতিবাদী দর্শন ছোটদের সমস্যাকে মূলত নারীবাদী সমস্যা হিশেবে দেখার জন্য একটি তাত্ত্বিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে যার ভিত্তি হল শোষণ ও নিপীড়ন। যদিও বিশ্বজুড়ে পরিবেশ ধ্বংস এবং দূষণের ফল ভোগ করছে সমগ্র মানবজাতি, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বলরাই বেশি ভুক্তভোগী হয় এক্ষেত্রেও। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে ছোটদেরই এই বোঝা বইতে হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব, রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থের প্রভাব, অপরিষ্কার দূষিত পরিবেশে বসবাস, অস্বাস্থ্যমূলক শৌচাগার, শিল্পায়নের ফলে জমির প্রকৃতি, ফলন বদলে যাওয়া— এই সমস্ত যাবতীয় কুপ্রভাবের ফলে যে ছোটদের সাধারণ জীবনযাপনের ন্যূনতম মানও রক্ষা পায় না আর এর ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত যে তারাই হয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ ছড়িয়ে থাকতে দেখি চেরনোবিল, ভোপাল, ইথিওপিয়া এবং সারা পৃথিবী জুড়েই। চিকি যখন শহরে থাকতে আসে, সেও শিকার হয় এর। তার বাস এক অনুন্নত দেশে। সেই দেশের প্রান্তিকের থেকেও প্রান্তিক তার অবস্থান। কাজেই তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় না এর। আচিবির প্রায় সমস্ত লেখাতেই দেখা যায় যে নাতির ওপর ঠাকুরদার, শহরের ওপর গ্রাম এবং খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির ওপর দেশীয় অখ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের প্রভাব রয়েছে।

'চিকি আর নদী' আরম্ভ হয় গ্রাম থেকে। এটি লেখা হয় অন্য ধরনের এক শোষণের প্রতিবাদ হিসেবেই। আচিবির বড় মেয়ে চিনেলো। তাঁর মতে, প্রথম সন্তানকে বড় করে তুলতে অন্যান্য আরো অনেক বাবা মায়ের মতনই তাঁরা অনেক ভুলচুক করেছিলেন। কিন্তু চিনেলো তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিল। চার বছর বয়সে নিজের জগত আর অভিজ্ঞতার কথা বাবা মাকে এসে বলত সে। একদিন সে বলল যে ''আমি কিন্তু বাদামি, আমি কালো নই।'' এর পরই তাঁরা নড়েচড়ে বসেন। প্রথমেই তাঁদের মনে হয় যে এসব কথা মেয়ে স্কুল থেকেই শিখছে নিশ্চয়ই কারণ স্কুলটি অনেক সাদা চামড়ার মহিলা পরিচালিত একটি স্কুল। কিন্তু সেখানে খোঁজ নিতে তাঁরা আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তাহলে এসব শিখছে কোথা থেকে? আচিবি অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন এবং দেখলেন যে ইউরোপ থেকে আমদানি ঝকঝকে রঙিন, দামি সমস্ত ছোটদের বই লাগোসের সুপারমার্কেটে সাজানো রয়েছে। আচিবির স্বীকারোক্তি যে তাঁর মত অনেক বাবা-মা, যাঁরা নিজেদের ছোটবেলায় কোনদিন ছোটদের বই পড়েননি, এই সব বই পাওয়া তো দূরস্ত, চোখে দেখার সুযোগও পাননি, তাঁরা ছেলেমেয়েদের হাতে এই বই তুলে দিতে পারাকে আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদ বলেই মনে করেন। কিন্তু এই সমস্ত বইতে যা রয়েছে তা তাঁর মতে সভ্যতা নয়, বরং সীমাহীন অজ্ঞতা এবং নিম্নরুচির পরিচায়ক এবং অবশ্যই অপমানজনক। এই চকচকে মলাটের আড়ালে কি ধরনের গল্প থাকে তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি— একটি সাদা চামড়ার বাচ্চা ছেলে উজ্জ্বল গ্রীষ্মের এক দিনে, এক খোলা জায়গায় ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। পেছনে অপূর্ব সুন্দর সব বাড়ি এবং গাছে ঢাকা রাস্তা। সুন্দর হাওয়া বইছিল এবং বাচ্চার ঘুড়িটা অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। শেষমেশ সেটা এতটাই উঁচুতে উঠে গেল যে, আটকে গেল সেই সময় ওখান দিয়ে যাওয়া একটা এরোপ্লেনের ল্যাজে। উড়োজাহাজের সাথে সাথে ঘুড়ি চলল শহর, সমুদ্র, মরুভূমি সব ছাড়িয়ে। তারপরে এল গভীর বন, ঘন জঙ্গলের ওপরে। সেখানে আমরা দেখতে পাই সব বন্য পশু আর খোলা জায়গায় দেখি গোল

* অধ্যাপিকা, মানবীবিদ্যা বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩

গোল কুঁড়েঘর। আফ্রিকার একটা গ্রাম। ঘুড়িটা কোনভাবে ছিঁড়ে গেল আর নীচে পড়তে থাকল। উড়োজাহাজ উড়ে চলে গেল। ঘুড়িটা পড়তে পড়তে একটা নারকোল গাছে এসে আটকে গেল। এদিকে গাঁয়ের একটা ছোট্ট বাচ্চা কালো ছেলে নারকোল পাড়তে গাছে উঠে এই অদ্ভুত, ভয়াল দর্শন জিনিসটা দেখতে পেল আর অমনি বিকট চিৎকার করে গাছ থেকে প্রায় পড়ে গেল। তার মা বাবা, প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে এল এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আলোচনা করতে থাকল যে এবারে তারা কি করবে? শেষে তারা গ্রামের ওঝাকে ডেকে পাঠাল। নানান পালকে সুসজ্জিত হয়ে, সঙ্গে বাজনদার নিয়ে ওঝা এল। এসে বলি দিয়ে, মন্ত্র পড়ল, তারপরে তার সবথেকে শক্তিশালী সঙ্গীকে গাছে উঠে 'জিনিস'টা পাড়তে বলল। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সেটা পেড়ে আনল। তারপর ওঝা গ্রামের সবাইকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে সেই নারকোল গাছ থেকে গ্রামের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে গেল যেখানে সেই 'জিনিস'টাকে পোঁতা হল এবং আজও নাকি সেটা ভক্তিভরে পুজো করা হয়।

ঐ সমস্ত চকচকে বই, যেগুলো হয়ত মা বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে উপহার দিয়ে থাকেন, সেই সমস্ত দামি, বাইরে থেকে আমদানি করা ছোটদের বইগুলোর মধ্যে এই গল্পটাই সব থেকে নাটকীয় ছিল। যেগুলো বাইরে থেকে খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু আদতে খুবই নিম্নমানের। ফলে যখন আচিবির বন্ধু, নাইজিরিয়ার ক্রেমব্রীজ ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি কবি ক্রিস্টোফার ওকিবো সেই সময় তাঁকে, তাঁদের জন্য একটা ছোটদের বই লিখতে বলেন, আচিবি নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে যান। কারণ এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারছিলেন। অতএব এই সময় তিনি লেখেন 'চিকি আর নদী' আর বইটি উৎসর্গ করেন চিনেলো আর ওনার সমস্ত ভাইপো, ভাইঝি, বোনপো বোনঝিদের।

এ প্রসঙ্গে তিনি এটাও বলেন যে ''আমি সবকিছু খুব সহজ করে ফেলছি। শিশুরা ছোট হতে পারে, কিন্তু ছোটদের বই লেখা মোটেও সহজ নয়। ('দ্য এডুকেশন অভ দ্য ব্রিটিশ প্রোটেক্টেড চাইল্ড' পৃ ৬৮-৭১)। একটি ছোট বুদ্ধিমান, সাহসী ছেলেকে কেন্দ্র করে কাহিনি গড়ে উঠলেও, চিকির গল্প কিন্তু উদ্বিগ্ন, প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের কাছেও অর্থবহ।

গল্পের শুরুতে মাকে ছেড়ে, নিজের গ্রাম ছেড়ে চিকি কাকার সঙ্গে পাড়ি দেয় শহরে। কেঁদে ফেলে যাওয়ার সময়। কিন্তু মা বোঝায় যে সে এখন বড় হয়ে গেছে। ('চিকি আর নদী', পৃ ১০)। ব্যস চিকি চোখ মুছে নেয়। তারপর নিজের বাক্স নিয়ে কাকার পেছন পেছন চলে চিকি। লরি ধরে শহরে পৌঁছতে হবে তো! আর সেই লরি ধরার জন্য আবার হাঁটতে হবে আধ মাইল। যাই হোক, এই যাত্রার শেষে এসে পৌঁছয় চিকি কাকার বাড়িতে। কেমন বাড়ি?

''পঞ্চাশটা লোকের বাড়িটায় উঠোনে দুটো মাত্র পায়খানা। একটা বড়োদের, আর একটা বাচ্চাদের। দুটোই নোংরা, বাচ্চাদেরটা তো জঘন্য। বিশাল-বিশাল মাছিতে ভর্তি, এত বড়ো মাছি উমুওফিয়ায় কোনোদিন দেখেনি চিকি। ঘেন্নায় রি-রি করে গা। চিকি তাই বেশ বুঝে ফেলেছে, বড়ো শহর হলেই যে সেটা গাঁয়ের চেয়ে সবসময়ে ভালো হবে, এমন কোনো কথা নেই।'' ('চিকি আর নদী', পৃ ১৬)। চিকির বন্ধুত্ব হয় কাকার কাজের লোক মাইকেলের সঙ্গে। সে তাকে কাজে সাহায্যও করে। শ্রেণী বিভাজনের সামাজিক সীমারেখা ছোটদের ভালভাবে রপ্ত হয় না বলেই কি এই 'কাজের লোকের' সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয় বারবার? নাকি 'ছোটলোক' বলে পরিচিত এই সব নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গেই 'ছোট'রা বেশি একাত্ম বোধ করে তাদের নিজেদের প্রান্তিক অবস্থানের জন্যই! তবে, কাজের লোক কিন্তু ভোলে না উভয়ের শ্রেণীগত পার্থক্য। তাঁরা বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় 'বড়' কিনা! অবস্থার ফেরে বিত্তবান মনিবের আর্থিক অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, তাতে শ্রেণীগত বিভাজন যে মুছে যায় না, এ তাঁরা ভালোই জানে!

বড়দের কথা এবং কাজের অসংগতি, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানারকম কথা বলা এসবই ছোটদের কাছে ধরা পড়ে যায় কিন্তু তারা বড়দের মত কোন উপদেশ শোনাতে বসে না। চিকির গল্পে যেদিন ইশকুল চত্বর ধোয়া মোছা করছিল সবাই, ছুটির আগের দিনে সেখানে একটা ঘটনা পাওয়া যায়, যার মূল বক্তব্য অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়। কাজেই হেডস্যার যখন হঠাৎ 'আব্রাহাম' বলে ডেকে উঠলেন, তখন যাদের নাম আব্রাহাম নয় এমন কিছু ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে গেল ব্যাপারটা কি? আর ফাঁদে পা দিয়ে দিল! আব্রাহাম নামে আসলে সেখানে কেউই ছিল না। যেসব ছেলেরা অতিরিক্ত কৌতূহল দেখালো তাদের পাঠানো হল এক মিশনারির সঙ্গে অকিকপের গ্রামে। তার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হেডমাস্টারমশাই জানালেন যে ''অতিরিক্ত কৌতূহলেই তোমাদের এই হাল' আর ওদের শোনালেন 'সেই বেজায় কৌতূহলী' বাঁদরটির গল্প যার মাথায় বুলেট বিঁধে গিয়েছিল।'' ('চিকি আর নদী', পৃ ২৩)।

শেষে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত কৌতূহল আর সাহসই চিকির সাফল্যের অন্যতম কারণ অথচ হেডমাস্টারমশাই এই কৌতূহলের জন্যই 'শাস্তি' দিলেন বাচ্চাদের! সন্ধ্যেবেলা পরীক্ষার ফল জেনে ফেরার সময় চিকির মনে পড়ে একবার স্কুলের 'গবেট' ছেলেরা বুদ্ধি বাড়বে বিশ্বাস করে একজন দুষ্টু লোকের কাছ থেকে বাজে কতগুলো বড়ি কিনে খেয়েছিল আর পরীক্ষায় তারা সবাই বিশ্রীভাবে ফেল করেছিল। কেমন পাগলের মত আর রোগা হয়ে গিয়েছিল। সবাইকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। তারপর যখন সেরে গিয়েছিল তখন একজন স্যার ওদের নিয়ে লিখেছিলেন— ''একটি ছিল গবেট ছেলে এই আমাদের ক্লাশে, ... ফল বেরোলেই পষ্ট হলো, লাস্ট হয়েছেন ক্লাশে।'' ('চিকি আর নদী', পৃ ২৫)। সেই মজায় অবশ্য তিনজন 'গবেট'ও যোগ দিয়েছিল। এখানেই আবারও বেরিয়ে আসে সেই স্বাভাবিকতা আর সহজ ব্যাপার! একজন শিক্ষক ব্যঙ্গ করে ছাত্রের নামে ছড়া লিখলেন আবার সেই ছাত্ররাও তাতে যোগ দিল! যেন 'বড়'দের স্বাভাবিক অধিকার এসবে। এখানে 'ঠিক-বেঠিক', 'পলিটিক্যালি করেক্ট' মূল্যবোধের কোন ব্যাপার আসে না কারণ চিকির বাস্তব দুনিয়ায় সে সবের বালাই প্রায় নেই বললেই চলে। সেই জন্যই যখন সে কুড়িয়ে পায় ছটা পেনি, তখন কোন দ্বিধা থাকে না সেটাকে দ্বিগুণ করে ফেলার ইচ্ছে পোষণ করতে। তারপরে সেই ছ'পেনি নিয়ে সে প্রিয় বন্ধুর দ্বারস্থ হয়ে। কারণ এটাকে দ্বিগুণ করতে না পারলে তো আর নাইজার পেরোন যাবে না। স্যামুয়েল জাদুকরের কাছে গিয়ে পয়সা দ্বিগুণ করে নিতে বলল আর পয়সা যখন দ্বিগুণ হয়েই যাবে তখন তার থেকে কিছু নিয়ে বনমোরগের সিদ্ধ ডিম আর 'সূয়া' নামে বিশেষ ধরনের শিককাবাব খেয়ে ফেলতে কোন ক্ষতি নেই! তিন পেনিকে ছ'পেনি আর ছ'পেনিকে একশিলিং করে ফেললেই হল! আবার কি? অতএব চিকি আগে যা কখনো করেনি, তাই করে। তিন পেনি খরচা করে আর আস্ত একটা শিককাবাব খায়— একা! স্যামুয়েল 'রাস্তা'র ছেলেদের মত খেতে খেতে হাঁটার কথায় ভীষণ বকুনি দেয় চিকিকে। তাই তারা কাছেই একটা আমগাছের ছায়ায় বসে খায়। খেতে খেতেই চলতে থাকে স্যামুয়েলের সঙ্গে আড়ি ভাব আবার আড়ির কৈশোরপর্ব যেখানে বন্ধুত্ব হল সব থেকে মূল্যবান। আচিবি নিজের কৈশোরে প্রথমবার ওনিৎশায় আসার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'দ্য এডুকেশন অভ এ ব্রিটিশ প্রোটেক্টেড চাইল্ড' প্রবন্ধে। ওনিৎশা একটা জাদু শহর আর সেটা একদম সত্যি। একে তো এখানে আছে নাইজার নদী। তাছাড়া প্রথমবার গ্রামের ঘাট থেকে পকেটে পয়সা নিয়ে একটা বড় শহরে এসে স্বাধীনতার আনন্দটাও অন্যরকম। আর সেটা পূর্ণরূপে উপভোগ করতে গিয়ে তিনি আধ পেনি দিয়ে কেনা অনেকটা চিনেবাদাম একাই খেয়ে ফেলেন আর তারপর যেটা হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ এর বহুবছর বাদেও চিনে বাদামের নাম শুনলেই তাঁর পেটে ব্যথা হত!'' (পৃ ১৫)। চিকির এই স্বাধীনতা উপভোগ করার মাধ্যমে যেন বা সেই স্মৃতি ফিরে আসে একটু একটু।

জাদুকরের কাছে চিকিকে একাই যেতে হল কারণ স্যামুয়েল গেল অসুস্থ মাকে দেখতে। তার মায়ের হয়েছে বাতের ব্যথা যা কিনা 'বড়'দের হয়। নিজেকে প্রফেসর চ্যান্ডাস বলা জাদুকর আসলে ''একটা বেঁটে লোক, খয়েরি হয়ে যাওয়া একটা আলখাল্লা তার পরনে। প্যান্টটা বেঢপ। তেরপলের মতো শক্ত একরকম জিনিসে তৈরি— বসতে গেলেই খড়মড় করে আওয়াজ হয়।'' আর তারপরে জাদুকরের সঙ্গে চিকির নানা কথাবার্তা হল। উনি তো তিন পেনিকে দ্বিগুণ করতে হবে শুনে হেসেই অস্থির হয়ে গেলেন আর তারপরে চিকিকে ভালো লেগেছে বলে তাকে নাম জিজ্ঞেস করেন আর বলেন, ''চিকি। বাঃ বাবা কী করেন?' 'বাবা নেই', উত্তর দেয় চিকি। 'জানতাম, দেখলাম একবার পরখ করে।'' ('চিকি আর নদী', পৃ ৩৪)। আর চিকিও অবাক হয়ে যায় জাদুকরের এই ক্ষমতা দেখে! তারপর প্রফেসর চ্যান্ডাসের ম্যাজিকে অভিভূত হয়ে সে যা বলে তাতেই বিশ্বাস করে চিকি আর পরের দিন সকালে উঠে বুঝতে পারে, ঠকেছে সে। সারা সকাল মন খারাপ করার পরে দুপুরে সে গেল বন্ধুর বাড়িতে। ছোট ছোট বিষয় এত সাবলীলভাবে বলা হয়েছে এই কাহিনীতে যে নিজেদের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে যাওয়ার মজাটাই তো আলাদা! চিকি স্যামুয়েলের বাড়ি গিয়ে স্যামুয়েলের সঙ্গে বসে গেল গারি আর ওকারোর ঝোল খেতে। ''ঝোলের মধ্যে মাছের পরিমাণটা লক্ষ করে জিভ সুড়সুড়'' করছিল চিকির। আর যখন এস. এম. ও. জি.-এর সঙ্গে তার বাবাও একটু খেতে বলল, তখন সে দিব্যি বসে জামায় একটুও দাগ না ফেলে খেয়ে নিল। ('চিকি আর নদী', পৃ ৩৮)। তারপরে দুজনে যায় জাদুকরের বাড়ি। সে বেমালুম অস্বীকার করে সব কিছু। উল্টে এমন ভয় দেখায় যে দুজনেই টেনে দৌড় লাগায়। এইভাবেই জীবনের শিক্ষা ঠেকে শিখতে থাকে চিকি। কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা দিয়ে তার কাজ হয় না। অতি লোভে, কাজ না করেই পয়সা বাড়ানোর ইচ্ছেও কার্যকর হয় না।

লোভের পরিণাম যে ভাল হয় না তা 'বাঁশি' গল্পটিতেও দেখতে পাই। 'বাঁশি' গল্পটি পড়তে গিয়ে প্রতিপদে মনে পড়ে যায় বাংলার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'সুখু আর দুখু'র গল্প। অথবা প্রচলিত কাঠুরিয়া আর জলদেবতার গল্প এবং বোধহয় এর মিল রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় ছোটদের জন্য সৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন রূপকথা, উপকথা, লোককথার সঙ্গে। আসলে এখানেও সেই কিছুটা 'মান্য করা' আর 'ভাল' হওয়ার উপদেশ। তবে এই কাহিনীতে হয়ত বা রয়েছে মূল কথাটি। আসল হল ক্ষমতাকে মান্য করা আর নিজের লক্ষে অটল থাকা, সৎ থাকা।

নারীনিসর্গনীতিবাদী তত্ত্ব শিশু-কিশোর কেন্দ্রিক সামাজিক মূল্যবোধের ধারণাকে শুধুমাত্র বৃহত্তর সমাজের অংশ হিশেবেই দেখার পরিবতর্তে একজন আলাদা অন্যরকম ব্যক্তি হিশেবেও ছোটদের জন্য নৈতিক চিন্তাভাবনার কথা বলে থাকে। ঠিক যেমন নারীনিসর্গনীতিবাদ একটি সামাজিক আন্দোলন হিশেবে সামাজিক অতি-সরলীকরণের বিরোধিতা করে বিশ্বের নারীসমাজের বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিকে সমর্থন করে এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটি সংহতি খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যায়, তেমনই এখানে শৈশবের ধারণাও বহুমুখী ও বৈচিত্র্য ভরপুর। আলোচ্য কাহিনীগুলিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। নারীনিসর্গনীতিবাদ একটা মূল্যবোধের পরিকাঠামোর সংজ্ঞা নিরূপণের মাধ্যমে ছোটদের সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে তাদের আস্থা পুনরার্জনের একটা সুযোগ করে দেয়। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতেই ছোটদের জীবনের বাধাবিপত্তি এবং জটিলতা সমূহের মোকাবিলা করা যাবে মনে করা হয়। লালনপালন এবং ক্ষমতায়নের চিন্তা বাঁধা রয়েছে সম্পর্ক, বহুমুখীনতা, অন্তর্ভুক্তি এবং রূপান্তরের মত পারস্পরিক সমর্থনকারী বিষয়গুলির সূত্রে। আমরাও এই পারস্পরিক সূত্রেই সেই পৃথিবী যেখানে ছোটদের প্রয়োজন ও চাহিদার উত্তর দেওয়া এবং তাদের অবদান গ্রহণ করা হবে তা গড়ার কাজে সমর্থন পাই। চিকি যখন সবাইকে জানাল যে পাহারাদার মিথ্যে বলছে তখন কিন্তু পরিষ্কার করে বলা আছে যে একটা ছোট ছেলের কথায় কেউ হয়ত কান দিত না। কিন্তু গণ্ডগোল করল পাহারাদার। সে গিয়ে চিকির গলা চেপে ধরে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলল বলেই সবাই প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এই আচরণে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করল বলেই চিকির কথাকে গুরুত্ব দিল তারা। ('চিকি আর নদী', পৃ ৫৮)। কাজেই দেখা এবং বোঝা গেল যে, বড়দের স্বাপেক্ষে, বড়দের আচরণের ওপরেই নির্ভর করে ছোটদের কথা গুরুত্ব পাবে কি পাবে না!

চিকির গল্প প্রসঙ্গে আচিবি বলেন ''চিকি আমার প্রথম ছোটদের জন্য লেখা বই। ছোটদের জন্য জন্য লেখাটা আমি খুব উপভোগ করি। আমার কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা চ্যালেঞ্জ যেটা বারবার গ্রহণ করতে ভালো লাগে কারণ সম্পূর্ণ অন্যধরনের এক মানসিকতার প্রয়োজন হয় এই কাজে। আমাকে সম্পূর্ণভাবে একটা বাচ্চার মনোজগতে ঢুকে পড়তে হয় যেটা খুবই লাভজনক। আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই এটা কোন না কোনভাবে করা উচিত। সবাইকে যে গল্প লিখতেই হবে তার কোন মানে নেই, কিন্তু আমাদের বারবার শৈশবে ফিরে যাওয়া উচিত। আর যখন তুমি ছোটদের জন্য লিখবে তখন কিন্তু শুধুমাত্র বাচ্চার মত করে ভাবলে হবে না, আমার মনে হয় সেই সময়টুকুর জন্য তোমাকে একটা বাচ্চা হয়ে যেতে হবে।''

আচিবির বিশ্বাস, বাচ্চা মানুষ করতে গিয়ে আসলে বড়রাই শেখে। বাবা হিসেবে সেটা তিনি জানেন এবং মনে করেন যে সেটা একধরনের বিনম্রবোধের জন্ম দেয়। এটা খুব বাস্তব একটা বিষয়। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে সবকিছুতেই ছাড় দেওয়া যাবে এবং একটি বাচ্চাকে কখনোই শুধরে দেওয়া চলবে না। কারণ, আমরা সেই সব বহুবছর ধরে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় ভর করে কথা বলছি যা বাচ্চার পক্ষে জানা একপ্রকার অসম্ভব প্রায়। (কট, পৃ ৮৬)।

আচিবির দুটি আলোচ্য গল্পেই এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। বাচ্চা আসলে পূর্বপুরুষের প্রতিনিধি এবং অন্য জগত থেকে এসেছে, এটা মেনে নিলেই সেই জগতের সঙ্গে নিজের পরিচয় আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যায়। তাঁর মতে এভাবে ভাবাটা বেশ ভালো কারণ আসলে এগুলো আমাদের অভিজ্ঞতার রূপক। আমরা সত্যিই জানি না কিন্তু। আমরা শুধুমাত্র শব্দকে ছবির মত ব্যবহার করতে চেয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়মিত মোলাকাত হতে থাকা আবছা অথচ জোরালো ধারণাগুলোকে বলার চেষ্টা চালিয়ে যাই। আচিবি জানান (কট, পৃ ৮৫-৮৬) যে, অতীতে তাঁর সমাজে, একটি বাচ্চা জন্মালে, তার বাড়ির লোকেরা একজন দৈবজ্ঞের কাছে জানতে যেত যে, কোন পূর্বপুরুষ এই শিশুটির মাধ্যমে আবার এলেন? তারা জানতে চাইত যে এই নতুন আগন্তুক কি এই শিশুটির বাবার বাবা? নাকি বাবার ঠাকুর্দা?

অতএব শিশুটি মোটেই নতুন নয়। আর তার পরিচয় জানার পরে তাকে সেই শ্রদ্ধা আর সম্মান দেওয়া হত। আচিবি জানেন না যে ঠিক কি পদ্ধতিতে এটা নির্ধারণ করা হত এবং এটাও জানেন না যে এর অর্থ কি এই যে একেবারে অবিকল সেই পূর্বপুরুষটিই আবার জন্মগ্রহণ করেছেন নাকি তাঁর স্বভাব চরিত্র বৈশিষ্ট্য এই শিশুটি পেয়েছে? এটা তাঁর কাছে এবং সবার কাছেই একটা রহস্য। কিন্তু তিনি বলতে চান যে, প্রতীক হিশেবে এগুলোই প্রচলিত। বাচ্চারা তাদের ঠাকুরদার মত হয়, বাবার মত নয়। এবং প্রায়ই দেখা যায় যে ঠাকুরদার সঙ্গে নাতিনাতনির সম্পর্ক অনেক বেশি কাছের এবং মধুর হয়। ইবো সমাজের বিশ্বাস যে পূর্বপুরুষের অন্য জগত এবং মানুষের দুনিয়ার মধ্যে এই যে নিরন্তর যাতায়াত যার ফলে সেই অন্য দুনিয়া সম্পর্কে জানা যায়, তা ঘটে কিন্তু শিশুটির মাধ্যমেই। কারণ সে সেখান থেকে আসছে। যে সমস্ত বৃদ্ধ মানুষ সেই জগতে চলে যাচ্ছেন, তাদের পরিবর্তে ছোটরাই সেই দুনিয়া সম্পর্কে বেশি জানে কারণ তারা সদ্য সেখান থেকে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে।

পরিবার যেন ছোটদের কাছে এবং অবশ্যই সমাজের কাছে অদৃষ্টের মতই অমোঘ। বড়-ছোট সম্পর্কের বিন্যাসে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ সেখানেই রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরতা, সমঝোতা, ভালবাসা। চিকির পরিবারে 'বড়'রা মোটেই আদর্শ ভালমানুষ নন। যেমন চিকির কাকা। তিনি ভারি কড়া মেজাজের। ''কথাটথা প্রায় বলেনই না। হাসিও নেই; হাসতে দেখা যায় তখনই যখন প্রতিবেশী মিস্টার এন্ওয়ানা কি অন্য কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে তালের রস কি আর কোন ঠান্ডা পানীয় তিনি খান। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চিকিও যদি খেলা করে, ওঁর খুব আপত্তি, এটা নাকি সময়ের অপব্যয়। তাঁর মতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবসময়ে কেবল বই পড়বে কিংবা অঙ্ক কষবে ব্যস!'' ('চিকি আর নদী', পৃ ১৪)। অতএব দেখাই যাচ্ছে যে, চিকির কাকা একদম যেন সেই 'বড়'দের মত যারা শুধু বড় হয়ে যাওয়ার জন্যই ছোটদের ওপরে কর্তৃত্ব ফলানোর অধিকার পেয়ে গেছেন বলে মনে করেন। কাকার কাছে নদী পার হওয়ার পয়সা চেয়ে জোটে কাকা আর মিস্টার এন্ওয়ানার কাছ থেকে ব্যঙ্গ। তবু বিশ্বাস হারায় না চিকি। ঠেকে শিখে এক এক করে লোভ, অহংকার, চালাকির অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারে সে।

নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে কিন্তু রয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাস। আচিবি এটা মানেন যে অল্পবয়সী পাঠকের প্রতি শিক্ষকের ভূমিকা পালনের দায় তিনি এড়াতে পারেন না। তিনি জানান, ''আমার অধিকাংশ পাঠকই অল্পবয়সী। তারা হয় স্কুল অথবা কলেজে পড়ছে অথবা সদ্য কলেজ পাশ করেছে। এবং তাদের অনেকেই আমাকে একপ্রকার শিক্ষক হিসেবেই দেখে।'' ('দ্য নভেলিস্ট অ্যাজ টীচার', পৃ ৪১)। চিকির গল্পে তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ফাঁকি দিয়ে যে কোন কাজ আসলে হয় না সেই শিক্ষা এ কাহিনীর প্রতি মুহূর্তে। ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর সাহসের কোন বিকল্প নেই একথা প্রমাণ হয় বারবার। শেষমেশ, চিকি কোন চালাকি অথবা শস্তায় বাজিমাতের পরিবর্তে, নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রমেই অর্জন করে নেয় তার স্বপ্ন সফল করার জন্য একটা শিলিং।

আচিবির মতে স্বার্থত্যাগ, অহং, গর্ব, লোভ, জীবন-মৃত্যুর অর্থ— এই ধরনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গল্প বলা হচ্ছে সমাজের সর্বাপেক্ষা কম তাৎপর্যপূর্ণ সদস্য ছোটদের, এবং সেটা কিন্তু তাদের জন্য খুব চমৎকার বিষয়। বাচ্চারা সবসময়েই জানতে চায় যে কে এই দুনিয়া সৃষ্টি করল? কিভাবে কিছু মানুষ কষ্ট পায়? কে মৃত্যু সৃষ্টি করল?... আসলে প্রায়শই, আমরা তুচ্ছ সব বিষয়ের জালে আটকে পড়ি... অন্যদিকে চলে যাই। কিন্তু মূল প্রশ্নটা এখনো একই রয়ে গেছে এবং মূলত এগুলো নিয়েই ছোটদের গল্পের কারবার।

'বাঁশি' গল্পটিতে একটি লোকের দুটি স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী স্বামীর অনুগত। ছেলেটিও বাবা মায়ের বাধ্য। কিন্তু বাঁশি আনতে গিয়ে সে বজায় রাখে নিজের জেদ। অপরদিকে দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর অনুগত নয়, লোভী এবং সে বাধ্য করে তার ছেলেকে ভূতের রাজ্যে যেতে। এই ছেলেটি কিন্তু মায়ের কথা শোনে। অথচ শাস্তি পায় সে। আসলে প্রথম ছেলেটি বাবা মায়ের কথা অমান্য করলেও সে মেনেছিল মানুষের থেকেও বড় ভূতের রাজার কথা। আর মেনেছিল কিছু মানবিক মূল্যবোধ। আর দ্বিতীয় ছেলেটি মায়ের কথা শুনলেও অমান্য করেছিল ভূতের কথা। মানেনি কিছু মানবিক মূল্যবোধ। ভূতের নির্দেশ অমান্য করেছিল ফেরার সময়। যদিও কোথাও জানা যায় না যে তার ফলে কি হল কারণ সে তো নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এল! হয়ত বা তার ফলেই তার বাকি শাস্তি! জানতে ইচ্ছে করে যদি সে এই শেষের নির্দেশটুকু পালন করত তাহলে কি তার অন্তিম পরিণতি এত ভয়ঙ্কর হত না! অথবা মহিলার অন্য ছেলেমেয়েরা যে মারা গেল, তারাই বা কি অপরাধ করল? মানুষের পাপের শাস্তি মানুষকেই ভোগ করতে হয়, সেই দায় বহন করতে হয়। বড়দের দায় তাই অবধারিতভাবেই ছোটদের ওপরে বর্তায় অলিখিত শর্তে।

'বাঁশি' গল্পটির ক্ষেত্রে আচিবি আফ্রিকার বিভিন্ন সমাজে বহুল প্রচারিত একটা সহজ সরল লোককথার নবনির্মাণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি এটা সচেতনভাবে করেছেন যাতে ছোটদের, সমাজ সম্পর্কে ধারণা এবং সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা দেওয়া যায়। (এমারজিং পার্স্পেক্টিভ অন চিনুয়া আচিবি, পৃ ৪৩৬)। তাই প্রথম ছেলেটি অবাধ্যতা সত্ত্বেও তার বাঁশিটি ফেরত পায় এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত উপহার পাওয়ার যুক্তি হিসেবে ছেলেটি ভূতের রাজাকে মাথা নীচু করে জানায় যে বাঁশিটি তার নিজের হাতে তৈরি যার কোন বিকল্প হতে পারে না এবং এটাও জানায় যে নিজের বলতে তার শুধুমাত্র এই বাঁশিটিই রয়েছে আর কিছু নেই। তাই অন্ধকারে, ঠান্ডায় বাঁশিটি একলা পড়ে থাকবে সেটা মানতে না পেরেই সে বাবা মায়ের অবাধ্য হওয়ার মত অন্যায় করে ফেলেছে। এখানে আচিবি নিজেই বলেছেন— ''... আমার মনে হয় যে অবাধ্যতার স্বপক্ষে এভাবেই যুক্তি খাড়া করা উচিত। ছোটরা হয়ত প্রশ্ন করবে না। কিন্তু, এটা তাদের জন্য অস্বস্তিদায়ক। মানে, ধরুন, আপনি যদি তাদের বলেন, 'তোমরা অবশ্যই মা বাবার কথা মেনে চলবে!' তাহলে সেই ছেলেটি, যে বাবা মায়ের অবাধ্যতা করল আর তা সত্ত্বেও শেষে গিয়ে পুরষ্কৃত হল, কেন হল? কাজেই আমি চাইব যাতে প্রশ্নটি তোলা হয়। যাতে ছেলেটি একটা যুৎসই জবাব দিতে পারে এবং সর্দার ভূত প্রশ্রয়ের সঙ্গে বলতে পারে 'তাই বলে এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। তবে তোমার উদ্যম আমার ভালো লেগেছে। তোমার সাহস আমার ভালো লেগেছে।'' কাজে কাজেই বাধ্যতা যে নিয়ম সেটা বলা হল, আবার সাহস যে গুরুত্বপূর্ণ সেটাও প্রতিষ্ঠা করা গেল।' অর্থাৎ গল্পটা অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রয়োজনমত জরুরী বিষয় আনা হল। আচিবি ইচ্ছাকৃতভাবেই বহুবিবাহের অভিশাপকে নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করেছেন যাতে আজকের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে জেনেবুঝে নির্বাচন করতে পারে। এই গল্পের নীতিকথা এতটাই প্রকট যে বাচ্চারা ভুলবে না। এখানে ছোটদের লোভ, অতি উচ্চাশা, ঈর্ষা, হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, অবাধ্যতা, আত্মম্ভরিতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সারল্য, বিনয়, সাহস, সততা, কঠোর পরিশ্রম, দয়া, এবং আত্মবিশ্বাসের মত গুণগুলির প্রশংসা করা হয়েছে। লোককথাকে পরিবর্তিত রূপ দিতে গিয়ে আচিবি সমসাময়িক কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন। এভাবেই প্রথম ছেলেটির উপহার বদলে হয়ে যায় 'সোনা, রুপো এবং পেতল, জামাকাপড় এবং মখমল', যেগুলো কিনা সম্পদের আধুনিক প্রতীক।

চিরাচরিত ক্ষমতা কাঠামোর ওপরে অবধারিতভাবেই থাকে বড়রা আর সেই ক্ষমতায় থাকতে গেলে প্রশ্নহীন আনুগত্যই ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। অতএব শিশু এবং নারী উভয়েই যখন ক্ষমতার বয়ানে শাসিতের স্থানে থাকে তখন আরও এক নিবিড় আত্মিক সম্পর্কের বুনোটে বাঁধা পড়ে তারা। ছোটরা সবসময়েই বড়দের ওপর বিশ্বাস বজায় রাখে এই ভেবে যে তাদের চিন্তাভাবনা ও মনোভাব গুরুত্ব পাবে ও সাড়া পাবে। যখন আমরা শৈশব সম্পর্কিত বড়কেন্দ্রিক ধ্যানধারণা ও তা থেকে উদ্ভূত সেই সংক্রান্ত সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সংস্কার বিষয়ে অপর্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি, তখন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। (স্কাই, পৃ ২০৮)। এই 'বিশ্বাস' আর 'বিশ্বাসঘাতকতা' নিয়েই চলে জীবন যা আচিবির লেখায় এসেছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের মতই।

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং মানব—অমানব প্রকৃতির ভেতরে ন্যায় এবং সহানুভূতিশীল সম্পর্কের প্রচারের মত পারস্পরিক সহায়তামূলক প্রকল্পে নারীনিসর্গনীতিবাদী দর্শন এবং সক্রিয় আন্দোলন নিয়োজিত। সম্পর্কের মূল্যবোধ গোষ্ঠীজীবনের প্রতিটি ব্যক্তির অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের কথা বলে থাকে। ছোটদের কণ্ঠস্বর যেন অন্যান্য সবার মতই শোনা যায়। অর্থাৎ খেয়াল রাখা দরকার যে, ছোটরা যেন প্রতীক বা বোড়ে হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

নারীনিসর্গনীতিবাদের অন্যতম মূল বক্তব্যের কিছুটা আচিবি নিজেই বলেছেন। হয়ত অজান্তেই; ''একটা দ্বর্থ্যবোধ। সব কিছুরই দুটি দিক রয়েছে। 'যখনই কোনকিছু দাঁড়ায়, তার পাশাপাশি অপর কিছুও থাকে। এটা আর একটা খুব জোরালো ইবো বিবৃতি। সম্পূর্ণ সত্যিও বটে, এবং যখনই কেউ এই 'অপর' বা 'অন্য'কে দেখতে অস্বীকার করে, তখনই তার সমস্যার শুরু।'' (কট, পৃ ৮৭)। নারীনিসর্গনীতিবাদীদের মতে, '' শেষ উত্তর দেওয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেই।'' (মৈত্র, পৃ ১৪২)। সম্পর্কের নানা রসায়ন, ক্ষমতার নানা সমীকরণের ছবি এঁকে আচিবি 'ক্ষমতা'র বৈষম্য ঘোচানোর কথাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলেছেন। কিন্তু এই বৈষম্য ঘোচানোর ক্ষেত্রে আসেনি আলাদা করে ছোটমেয়েদের কথা। প্রান্তিকেরও প্রান্তিক অবস্থানে থাকা তাদের স্বর এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। এর ফলে নারীনিসর্গনীতিবাদী দর্শনের সেই দিকটিও অনুপস্থিত থেকে যায় যেখানে পারস্পরিক

নির্ভরশীলতার সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশ, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জায়গাটাও সুরক্ষিত থাকবে একটি কাঁথায় কাপড়ের প্রতিটি টুকরোর ভিন্ন অবস্থানের মতই।

আচিবি ছোটদের কাছে নিজের ভাবনা, মূল্যবোধ, সমাজকে চেনানোর দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। নাইজেরিয়ায় লিঙ্গ সাম্যের মত সমাজে অনুপস্থিত বিষয় নতুন করে উপস্থাপনের চেয়েও আচিবির কাছে প্রয়োজনীয় ছিল তার সমাজের ঔপনিবেশিক প্রভাবে সৃষ্ট আত্মপরিচয়ের প্রবল সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এভাবেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি আপাত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে অন্যান্য 'গুরুদায়িত্বের' থেকে। আর তাই 'কিশোর' চরিত্রদের মায়েদের দেখা পেলেও, তাদের সমবয়সী অথবা অন্য মহিলা চরিত্র থেকে যায় অনুপস্থিত।

রোজ উরে মেজু তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম আফ্রিকার ঘানার আকানদের মত, কয়েকটি অংশত মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে পূর্ব আফ্রিকার নাইজিরিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক। আচিবি কিন্তু এই সমাজেই বেড়ে উঠেছেন। ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ শিকড়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ একজন সংবেদনশীল মানুষের মনে একই সঙ্গে দেশি-বিদেশি সংস্কৃতি, ভাল-মন্দ, নতুন-পুরোনো, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে পরস্পর বিরোধিতা থাকাটাই স্বাভাবিক। এই সবের মধ্যেই অন্য অনেক কিছুকে মেলাতে গিয়ে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ছোটদের কাছে প্রাঞ্জল করে সরসভাবে তুলে ধরতে গিয়ে, ছোটদের মধ্যেও যে লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান— সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলিতই থেকে গেছে। তবে, সমাজে নারীর ভূমিকা এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তী সময়ে তিনি জোরালো নারীস্বরের স্বপক্ষে বক্তব্য যেমন রেখেছেন, তাঁর পরবর্তী অনেক লেখাতেই প্রধান এবং মূল চরিত্র রূপে এনেছেন স্বাধীন, স্বাবলম্বী, ক্ষমতার অধিকারী নারীদের। কিন্তু তা মূলত বড়দের উপন্যাসে। ছোট মেয়েদের অবস্থান তাঁর লেখায় সেই প্রান্তেই রয়ে যায়।

আচিবি এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে গ্রামের গোষ্ঠীজীবনে সবার জায়গা রয়েছে। নারী, পুরুষ, বাচ্চা, আত্মা, দেবতা, জীবজন্তু এবং প্রকৃতি... এবং নারী এবং পুরুষ, জীবিত এবং মৃত... এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, জীবিত এবং মৃতর দুনিয়া এবং যে জন্মায়নি এখনো, তাকে নিয়ে, সবাইকে নিয়ে গোষ্ঠীজীবন। অর্থাৎ এটা একই সঙ্গে পার্থিব এবং অপার্থিব। অতএব গ্রামে তুমি যাই করনা কেন, এই সত্যিটা মাথায় রাখতে হবে। আরও বলেন যে, আজ যেমন আলাদা আলাদাভাবে আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মর কথা বলি, আগে কখনোই এরকম খোপে খোপে সবকিছুকে আলাদা করার কোন ব্যাপার কোনদিন ছিল না। আদি সমাজে সবকিছু একসঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল। ইবো সমাজে কোন মানুষ 'অধার্মিক' ছিলো না। এমনকি ইবো ভাষায় 'ধর্ম' বলে কিছুর অস্তিত্বই নেই— ''এককথায় এটা 'জীবন'— 'ইট্স সিম্প্লি লাইফ।'' (কট, পৃ ৭৮-৭৯) এখানেই 'জীবন'-যাপনে সবাই মিলে মিশে একসঙ্গে, পারস্পরিক নির্ভরতায় জড়িয়ে থাকার মত নারীনিসর্গনীতিবাদী ধারণার, একটা মূল ভাবনা যেন বলে দেন আচিবি। হয়ত এই বিশ্বাস নিয়ে লেখা হলেই চিকির সঙ্গে তার কোন কিশোরী বন্ধুকেও পেত পাঠক, অথবা হয়ত চিকির পরিবর্তেই পেত! মূল চরিত্র হিশেবে!

তথ্যসূত্র

চিনুয়া আচিবি, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, 'চিকি আর নদী', অনুবাদ— শ্রাবন্তী ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং

'চিকি এ্যান্ড দ্য রিভার', ২০১১, অ্যাঙ্কর বুকস, নিউ ইয়র্ক

'দ্য ফ্লুট', ১৯৭৯, ফোর্থ ডাইমেনশন, এনুগু, নাইজিরিয়া

এ্যান ইমেজ অব আফ্রিকা, ১৯৮৯, হোপস এ্যান্ড ইমপেডিমেন্টস, সিলেক্টেড এসেজ, ডাবলডেঃ অ্যাঙ্কর বুক্স

'দ্য নভেলিস্ট অ্যাজ টীচার', ১৯৮৯, হোপস এ্যান্ড ইমপেডিমেন্টস, সিলেক্টেড এসেজ, ডাবলডেঃ অ্যাঙ্কর বুক্স

'দ্য এডুকেশন অব এ ব্রিটিশ প্রোটেক্টেড চাইল্ড', ২০০৯, পেঙ্গুইন

'দ্যা রাইটার এ্যান্ড হিজ কম্যুনিটি', ১৯৮৯, হোপস এ্যান্ড ইমপেডিমেন্টস, সিলেক্টেড এসেজ, ডাবলডেঃ অ্যাঙ্কর বুক্স

কারেন জে ওয়ারেন, ১৯৯৪, 'টোয়ার্ড এ্যান ইকোফেমিনিস্ট পীস্‌পলিটিক্স', ইকোলজিকাল ফেমিনিজম, লন্ডন-নিউইয়র্ক: রুটলেজ

কারেন জে ওয়ারেন, ১৯৯০, 'দ্য পাওয়ার এ্যান্ড দ্য প্রমিস অব ইকোলজিকাল ফেমিনিজম', এনভায়রনমেন্টাল এথিকস ১২(২)

যোনাথন কট এর নেওয়া আচিবির সাক্ষাৎকার, ১৯৯৭, 'চিনুয়া আচিবিঃ এ্যাট দ্য ক্রসরোডস্, কনভারসেশনস্ উইদ চিনুয়া আচিবি', সম্পাদনা বার্নথ লিন্ডফর্স, ইউনিভার্সিটি প্রেস অব মেসিসিপি

রাইসা সিমোলা, ১৯৯৩, 'দ্য ফ্যট, দ্য ড্রাম এ্যান্ড হাও দ্য লেপার্ড গট হিজ ক্লজ বাই চিনুয়া আচিবি'। *নর্ডিক জার্নাল অব আফ্রিকান স্টাডিজ* ২(১): ৮৭-৮৯, জোসেনশু বিশ্ববিদ্যালয়, ফিনল্যান্ড

রুথান কার্থ স্কাই, ১৯৯৭, 'ইকোফেমিনিজম এ্যান্ড চিলড্রেন', ''ইকোফেমিনিজম, কালচার, নেচার'', কারেন জে ওয়ারেন (সম্পাঃ) , ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস

শেফালি মৈত্র, ২০০৩, 'নারী-নিসর্গনীতি', নৈতিকতা ও নারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেট তথ্যপঞ্জি:

রোজ উরে মেজু, http://www.uga.edu/~womanist/mezu1.2.htm [2/11/2009 1:17:59 PM] [WOMEN IN ACHEBE]

কারেন জে ওয়ারেন, ''ইন্ট্রোডাকশন টু ইকোফেমিনিজম'' lenvironmental.lilithezine.com/Introduction toEcofeminism.htm.

হিন্দি চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের সামাজিক বিবর্তন

সুমনা সাহা দাস*

বিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের সৃষ্টির খাতা যত পূর্ণ হয়েছে ততই প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে। এই ইতিহাসেরই একটি বৃহৎ ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল চলচ্চিত্র। তৎকালীন সমাজচিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটে একমাত্র সাহিত্য ও গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে। সেই গণমাধ্যমেরই উৎকৃষ্টতম আধার এই চলচ্চিত্র। মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যাওয়ার চাবিকাঠি। রঙবেরঙের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুভূতি, ভাবাবেগ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সহ প্রতিটি দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ চিত্র তুলে ধরে এই চলচ্চিত্র। এত রঙের মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবি রঙ নারী চরিত্র, যা রামধনুর মতো নানা রূপ নিয়ে, আঙ্গিক নিয়ে বারবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে এসেছে চলচ্চিত্রের মধ্যে।

দীর্ঘ ১০০ বছরের ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরবে মেয়েদের পথচলা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। বিশেষত প্রাথমিকভাবে দেখতে গেলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে এই ১০০ বছরের উপাখ্যানে নারী চরিত্র নিজেদের প্রকৃত স্থান করে নিতে প্রায় ১৭ বছর সময় নিয়েছে।

১৯১৩-তে যখন ভারতীয় সংস্কৃতি মাইলফলক সৃষ্টি করল প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তখন সেই বিশাল কর্মযজ্ঞে কোনও স্থানেই উঠে এল না কোনো নারী। দাদাসাহেব ফালকের রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রকাশিত হল বিনা রমণীর অভিনয়ে। অন্না সালুঙ্কে নামক একজন হোটেলে খাবার তৈরি করার লোক অভিনয় করল 'রানি তারামতী'র চরিত্রে। ভারতের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যে অভাগা নারীর কোনো স্থানই হল না। কারণ, "The women who chose the unconventional profession of action were looked down upon as prostitutes or women who were 'easily available'."

তবু সাহস দেখালেন দুর্গাবাই কামাত ও তার মেয়ে কমলাবাই গোখলে। ১৯১৩-তেই মোহিনী ভস্মাসুর চলচ্চিত্রে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করল তারা। কিন্তু ১৭ বছর পর ১৯৩১ সালে হিন্দি ছবিতে প্রথম 'নায়িকা' বা মূল নারী চরিত্রে একজন নারী অভিনয় করে। 'আলম-আরা' যা কিনা প্রথম সবাক ছবিও, এতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন প্রখ্যাত জুবেইদা। শুধু অভিনয় করাই নয় যথেষ্ট সাহসী পোশাকে (তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচারে) এবং সাহসী দৃশ্যে দেখা যায় তাকে।

অবশেষে পথচলা শুরু, তবে নায়িকা হয়েও সেসব যেন পার্শ্ব চরিত্রের মতই, কারণ 'Heroism' বলতে কেবলই পুরুষকেন্দ্রিকতা বোঝায়।

তবে এরই মধ্যে সম্পূর্ণ মহিলা কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র নির্মিত হল ১৯৪০-এ। 'অওরত' নামক চরিত্রটি তুলে ধরল তৎকালীন সামাজিক চিত্রে একজন নারীর প্রকৃত রূপ, আত্মত্যাগ, বাৎসল্য ও সংসার রক্ষার যাবতীয় প্রচেষ্টা। যদিও এর আগে ১৯৩৫-এ হান্টারওয়ালি, ১৯৩৬-এ 'অচ্ছুৎ কন্যা', ১৯৩৭-এ 'কিষাণ কন্যা'ও উল্লেখযোগ্য তবু 'অওরত' নিল এক অনন্য মাত্রা। ২৭ বছর পর ১৯৫৭-য় ভারতীয় সিনেমা পুনরায় ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখায় 'মাদার ইন্ডিয়া' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করে, যা 'অওরত'-এরই পুনর্নির্মাণ। দুই সিনেমাই মেহেবুব খানের পরিচালনায় নির্মিত। এক কথায় 'মাদার ইন্ডিয়া' ছিল ভারতীয় সমাজচিত্রে নারীর আদর্শ রূপ।

নারী চরিত্র, এক কথায় যদি তাকে বর্ণনা করতে চাওয়া হয়, তবে তা সমগ্র বিশ্বের কঠিনতম কাজ। তাই হয়ত চলচ্চিত্র জগৎও তার রং-কে একটি ফ্রেমে মেলে ধরতে অক্ষম।

নানা চলচ্চিত্রে নানা আঙ্গিকে সে কখনো নায়িকা, কখনো খল-নায়িকা। তবু ১০০ বছরের চলচ্চিত্র জগৎ নারীকে তার মাধুর্য থেকে টেনে বার করে আনতে পারেনি মূল নায়িকা বা নারীর ঘরোয়া প্রতিবিম্বকে তুলে ধরতে গিয়ে। যেখানে সে এই মূল সামাজিক ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেখানেই সে খল-নায়িকা হয়ে গেছে।

অধ্যাপিকা, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩

তবে যদি 'vamp' শব্দটিকে না ছুঁয়ে আলাদা করে শুধুই কেন্দ্রীয় নারী নায়িকা চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়, তা হলে চলচ্চিত্রের যে ঐতিহ্যের ইতিহাস তদানীন্তন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানকে প্রকৃতরূপে তুলে ধরে, তা থেকে বোঝা যাবে কীভাবে তা অতি ধীরে হলেও, ক্রমপরিবর্তিত।

সুদূর ১৯৫৭ থেকে বর্তমানে ২০১৪, দীর্ঘ এই ৫৭ বছরের পথে বহু নারী চরিত্র নির্মিত হয়েছে, নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে।

তবে 'মাদার ইন্ডিয়া' আদর্শ বধূর চরিত্র থেকে একেবারে পৃথক মাত্রা নিয়ে পৃথক গল্প নিয়ে ভাবছে বলিউডের হিন্দি সিনেমার পরিচালকরা। হিরোইন, ফ্যাশন— এই দুটি সিনেমা অভিনেত্রীদের জীবনের কঠোরতাকে তুলে ধরে। সেভাবে কোনো মূল পুরুষ চরিত্র দেখাই যায় না এখানে। চাঁদনি বার, চামেলি, হেট স্টোরি, ব্ল্যাক, নো ওয়ান কিলড জ্যাসিকা, দ্যা ডার্টি পিকচার, কাহানি, ইংলিশ-ভিংলিশ-সহ আরো অনেক চলচ্চিত্রই তৈরি হয় একবিংশ শতকে।

২০১৪-র মরদানি চলচ্চিত্রটি বর্তমান সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যা তুলে ধরলেও নারীকেন্দ্রিক সিনেমা হিসাবে অনন্যসাধারণ এবং বর্তমানে মেয়েরা কীভাবে নিজের অস্তিত্বকে পুরুষ শাসনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম তাও দেখানো হয়েছে।

তাই নারীর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবকে চলচ্চিত্রে কীভাবে তুলে ধরা হয় তা দুই যুগের দুটি চলচ্চিত্র মাদার ইন্ডিয়া ও মরদানির তুলনামূলক আলোচনায় প্রকল্পে তুলে ধরা হল।

দুটি সিনেমায় দুজন নারী, দুরকম প্রেক্ষিত, জীবনের দুরকম পরিস্থিতি ও সমাধানও ভিন্ন, তবে দুটি ক্ষেত্রেই বিপরীত পক্ষে পুরুষ শাসিত সমাজের রক্তচক্ষু ও অন্যায়ের শক্তিশালী প্রভাব এই দুই নারীর লড়াইকে করে তুলেছে একের থেকে ভিন্ন ও অনন্য করে।

'মাদার ইন্ডিয়া' নামের মধ্যে রয়েছে ভারতমাতার প্রতিরূপ। সহনশীল, মমতাময়ী, কর্তব্যপরায়ণ নারীর আদর্শই মাদার ইন্ডিয়া। চলচ্চিত্রটির মধ্যে দেশভক্তির ছোঁয়া একটি গানের মধ্যেও দেখা যায়। 'ও যানে ওয়ালা যাওনা ঘর আপনা ছোড়কে, মাতা বুলা রহি হ্যা তুমহে হাত জোড়কে'।

তবে ওই একটি গান ছাড়া বাকী সম্পূর্ণ সিনেমাই মূল নারী চরিত্র 'রাধা'-র জীবনবৃত্তে ভাগ্যের সাথে লড়াই নিয়েই দেখানো হয়েছে, তাই তার প্রতিটি আত্মত্যাগ সহনশীলতা স্বামী, শাশুড়ী ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সন্তানদের প্রতি মমতা, চরম বাধ্যবাধকতায় নিজের সতীত্ব রক্ষা, ভগবানের প্রতি অগাধ আস্থা দেখে মনে হতেই পারে চলিচ্চিত্রটির নাম মাদার ইন্ডিয়া না হয়ে 'অ্যা মাদার অব ইন্ডিয়া' হলে বেশি গ্রহণযোগ্য হত।

অন্য দিকে 'মর্‌দানি' শব্দটির নিজস্বতায় রয়েছে পুরুষোচিত ছোঁয়া অর্থাৎ সেই পুরানো 'নারী'-র ধারণাকে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে যেন বিপরীত দিকে মেনে নেওয়া অর্থাৎ একজন নারী যখনই তার কোমলতা, নমনীয়তা ভেঙে বেরিয়ে আসে নিজের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বলকে শাণিত করে প্রতিবাদ করে তখনই তার নারীত্বে প্রশ্ন ওঠে, এক্ষেত্রেও তাই চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'শিবানী রায়' নামক একজন মহিলা পুলিশ অফিসার হলেও সিনেমার নাম দেওয়া হল 'মর্‌দানি'। যে নামের মধ্যেই রয়েছে নারীদের যোগ্যতার প্রতি প্রশ্ন চিহ্ন।

অমিতাভ বচ্চনের 'মর্দ' নামক একটি সিনেমার বিখ্যাত সংলাপ ছিল 'মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা' অর্থাৎ পুরুষরা যেন লৌহশক্তির অধিকারী। এই 'মর্দ' শব্দটি থেকেই 'মর্‌দানি' শব্দের উত্তরণ। বোঝায়ই যায় নাম মাহাত্ম্যে রানি মুখার্জি-র 'নারী' হওয়ার গরিমায় রয়ে গেছে প্রশ্ন।

তবে সেদিক থেকে নারী কেন্দ্রীক এজাতীয় সিনেমা 'তেজস্বীনী, 'ফুল বনে অঙ্গারে' সহ অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলি নামের দিক থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত।

মাদার ইন্ডিয়ায় রাধার চরিত্রে নার্গিস স্ত্রী হিসেবে গৃহ প্রবেশের পর থেকেই তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্যের কালোছায়া নেমে আসে। সে নিঃশব্দে স্বামীর সেবা করে, নিজের এক মাত্র সম্বল বিয়ের গয়না দিয়ে সংসারের দারিদ্র মেটাতে চায়, স্বামীর প্রতিবন্ধকতাতেও হেরে যায় না তার মনোবল, তার স্বামী হার মেনে জীবন থেকে পালিয়ে যায়, স্বামী নিরুদ্দেশ হলেও জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে সে বলে 'ম্যা ঘর ছোড়কে নেহি জাউঙ্গি আগার যো আ গ্যায়ে তো।' অদ্ভুত এক ট্রাজেডি, তবুও সে পতিব্রতা, সন্তানরা একে একে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে অনাহারে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, তবুও সে নিজ সতীত্ব দান করতে গিয়েও স্বামীর ফিরে আসার আশায় আগলে রাখে।

বিপরীতে মর্‌দানির শিবানীর ভূমিকায় রানি সম্পূর্ণ পৃথক। সে একজন কেয়ারিং স্ত্রী কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে আবেগের উচ্ছলতা নেই, বিশেষ প্রকাশও নেই। বরং তার স্বামী (অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত) অপেক্ষা করে তার জন্য রাতে ফেরার, অন্যদিকে যিশু চোখে ওষুধ দিতে বল্লে সে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যস্ত থাকে নিজের শরীর চর্চা নিয়ে। যীশুর প্রতি তার শত্রুরা প্রতিশোধ নিলে তার আবেগ কেবল চোখের জলে প্রকাশ পায়, আবেগের অতি দেখনদারি থাকে না তাতে। তবে তার স্বামীই তার মনোবল বাড়ায় দুটি সংলাপে 'ছোড়না মত্ শালেকো, চাহে কুচ ভি হো যায়ে' এবং 'দিমাগ শান্ত রাখ না, ওকে! তুম জব শান্ত হোতি হো, তো সবসে খতরনাক হোতি হো'।

দুই নারীর স্বামীদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রায়ন হলেও দুই স্ত্রী মনোবলের দিক থেকে অভিন্ন।

সেদিক থেকে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্ক নিয়ে যদি সিনেমার ভূমিকা দেখা হয়, তাহলে সবথেকে উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হয়ে উঠতেই পারে স্ত্রী-র 'মেনে-ও-মানিয়ে' নেওয়া ও আত্মবলিদানের একটি চলচ্চিত্র 'অভিমান'।

'অভিমান' সিনেমায় স্ত্রী জয়া ভাদুড়ী নিজের গুণবলে স্বামী অমিতাভের থেকে অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করে, শুরু হয় আত্মাভিমানের সমস্যা। সেখান থেকে স্ত্রীর আত্মত্যাগ।

মর্‌দানি সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন ডাক্তার হয়েও নিজের পুলিশ স্ত্রীকে সম্মান ও মনোবল দিতে ব্যর্থ হয়নি ডাঃ বিক্রম রায়, তবে হয়ত পেশাগত ভিন্নতা কিছুটা সহায়তা করেছে।

মরদানির একটি দৃশ্যে দেখানো হয় শিবানি চাবি খুলে মধ্য রাতে ঘুরে ঢুকছে। নাম ফলকে প্রথম নামটি 'শিবানি' ও দ্বিতীয়টি তার স্বামীর 'ডাঃ বিক্রম রায়'। বোঝাই যায় সে 'একমেবঅদ্বিতয়ম'।

অন্যদিকে মাদার ইন্ডিয়ার নার্গিস ও রাজ কুমারের বিয়েতে প্রথমে দেখানো হয় সাত পাকের একটিতে স্বামী প্রথমে ও ট্রান্সিশন শটে' স্ত্রী চলে আসে সামনে। অন্য দৃশ্যে হাল টানার সময় একইভাবে দুজনকে দেখানো হয়। দৈহিক বলেও সে একজন পুরুষের সমান। সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে একা হাতে শিশুকে পিঠে বেঁধে ফসল ফলায়, বন্যার জলে দুই সন্তানকে মাচায় ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সমগ্র রাত। মানসিক ও দৈহিক শক্তির অভূতপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায় এই দুই যুগের দুই রমণীর মধ্যে।

দুটি চলচ্চিত্রে দুই প্রেক্ষিতে সামাজিক ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের রূপ ভিন্ন।

১৯৫৭-র চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে তৎকালীন মহাজনি ব্যবস্থার কদাকার চিত্র রূপ, অন্যদিকে ২০১৪-র বর্তমান সমাজে সেই নির্যাতনের রূপ শ্লীলতাহানি, নারী পাচার, ধর্ষণ ও খুন।

উভয় নায়িকাই লড়ে গেছে নিজ নিজ পথে। মাদার ইন্ডিয়ার মতোই তিলে তিলে সহ্য করেছে রাধা, স্বামীকে হারিয়ে, সন্তানদের মৃত্যু দেখেও লড়াই করেনি, তবে যখন সতীত্ব রক্ষার প্রশ্ন উঠেছে, তখন সে লাঠি তুলেছে, অন্য নারীর সম্মান রক্ষার্থে পিছপা হয়নি নিজের সবথেকে প্রিয় ও আদরের সন্তানকেও গুলি করে হত্যা করতে।

তবে রানি লড়েছে 'মর্‌দানি' হয়ে, শক্তি ও বুদ্ধিবলে। শারীরিক শক্তিকে পুরুষ শক্তির ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে কঠোর অধ্যাবসায়। সে লড়েছে নিজের সম্মানের জন্যে, অন্যের সম্মান বাঁচাতে, নারী পাচারের বিরুদ্ধে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে।

এক্ষেত্রে দুটি চলচ্চিত্রেই নারীর লড়াই ও অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার্থে।

প্রথমেই বলা হয়েছে 'heroism' শব্দটি নিজস্বতায় পুরুষতান্ত্রিক। তাই এই কথাটিকে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে যে নারী চরিত্রের জন্যে কেন এমন কোনো শব্দ সৃষ্টিই হয়নি অভিধানের পাতায়! উত্তরটি পাওয়া মোটেও সহজসাধ্য নয়, তবে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে হিরো তৈরি করতে গিয়ে পুরুষশাসিত সমাজ ভাবেইনি যে নারীরাও ভেঙে দিতে পারে সব পুরুষোচিত 'মিথ'।

তবে একটি চলচ্চিত্র যে নারীর তথাকথিত 'hero' চরিত্র না দেখিয়েও তাকে অনন্য করে তুলতে পারে তা বোঝা যায় শ্রীদেবী অভিনীত 'ইংলিশ-ভিংলিশ দেখলেই। কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন ঘরোয়া স্ত্রী, যে কেবল ভাল রান্না করতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র তা দিয়ে পরিবারের লোকজন বিশেষত তার স্বামী ও সন্তানকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, কারণ সে ইংরাজী বর্ণ বিন্দুমাত্র জানে না। এখান থেকেই তার লড়াই শুরু। নিজের একার চেষ্টায় সে ভিন-দেশে অপরিচিত পরিবেশে ইংরাজী শেখে ও তার সন্তানকে বোঝায় সে

মোটেও অপমানের বা অবহেলার নয়। এখানে সে নারীর মূল্যবোধকে ত্যাগ করে না, গৃহকোণের মাঝে নারীর ধারণাকেও ভাঙে না, তবুও সে হয়ে ওঠে একজন 'hero'।

অর্থাৎ 'hero' হয়ে উঠতে গেলেই যে শুধুই মর্‌দানি-র শিবানি হতে হবে তা নয়, নিজস্ব সত্ত্বায় দৃঢ়ভাবে টিকে থেকে নিজের অস্তিত্বের জানান দেওয়াও এক প্রকার heroism।

বর্তমান চলচ্চিত্রে মহিলাদের ভূমিকা অনেকাংশেই হয়ে উঠেছে এমনই প্রথা ভাঙা গল্পকে কেন্দ্র করে। ২০১৪-র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসে তাই হিন্দি সিনেমার অন্যতম লেজেন্ড অমিতাভ বচ্চন বলে গেলেন,

Asserting that the girls now were far more conscious of their rights, liberated and educated, this is now strongly reflected in Indian cinema. Films recently released have redefined the Indian women. "Referring to films like "Chandni Bar" and "Page 3" to buttress his point, he said: "These characters have had many, many shades that have moved away from the pre-set stereotypes of wife, of vamp or the sacrificing mother."

FURTHER READINGS

India & you. The world's window to India, 'HER JOURNEY IN INDIAN CINEMA WOMEN IN 100 YEARS OF INDIAN CINEMA.' https://mediaindiagroup.wordpress.com/tag women-in-100-years-of-indian-cinema

Roy, Amrita. 2012. The Journey of Women in Indian Cinema, The soft copy, An IIJNM web publication.http://www.thesoftcopy.in/afchive//softcopy 13/17_01_13_amrita_oped.html

Recent films have redefined the Indian women: Amitabh Bachchan, India Today in.http://indiatoday.intoday.in/story/amitabh-bachchan-kolkata-international-film-festival-recent-films-have-re-defined-the-indian-women/1/400182.html

Changing role of women in Indian cinema http://zeenews.india.com/entertainment/womens-day-2014/changing-role-of-women-in-indian-cinema_151663.html

Ray, Satyajit. 2002. Speaking of Films, Penguin, India

Saran, Renu. 2012. History of Indian Cinema, Diamond Books

ISSN No. 2277- 4831

bodhi kala

(A bilingual Journal)

Joint Editors :

Sukanya Sanyal, Dept. of English
Aparajita Bhattacharjya, Dept. of History

Associate Editors:

Sumita Chakraborty, Dept. of Political Science
Sutapa Bhattacharjya, Dept. of Sanskrit
Tripti Dhar, Dept. of Philosophy

Chief Advisor :

Tapan Kumar Poddar, Principal

Advisors:

Manindranath Pandit, Dept. of Commerce

Siddhartha Guha Roy, Dept. of History

Nabakishore Chanda, Dept. of Bengali

Arvind Pan, Dept. of Physics

Atanu Thakur, Dept. of Economics

Sutapa Kumar Rai, Dept. of Botany

Debasish Mukherjee, Dept. of Mathematics

*The authors are solely responsible for the contents of their papers/articles compiled in this volume. The publishers or editors do not take any responsibility for the same in any manner.
Errors, if any, are purely unintentional and regretted.

Principal , Vivekananda College
Thakurpukur, Kolkata - 63

Why bodhi ?

Bankim Chandra in Dharma-tattwa raised a million dollar question "what we are to do with life; what is to be done ?" (*Jibon loia ki koribo; ki korite hoy*?). This was probably the question which hunted a considerable section of our faculty members. In an untiring pursuit to solve this question, we came to realize that eternal quest for knowledge along with healthy exchange of opinion could be an effective starting point in our journey to the centre of this question. By exerting our freedom of expression and also by articulating our opinion, we may at least make our life more meaningful. This venture requires a platform for clarity of thought. Thus came the idea of *Bodhi*, a journal to be published exclusively by Vivekananda College. Not only the members of our faculty, any free thinker from any part of the globe is at liberty to contribute and express his/her valued opinion. We welcome articles from the experts of different subjects. We firmly believe that active participation of erudite persons shall enable the journal to rise to the pinnacle of glory in near future.

The advent of printing in 15th century Europe raised the human civilization to a majestic climax. Power of the printed word began to dominate the entire world. Pope Alexander VI, apprehensive of the development, warned in papal bull in 1501: "The art of printing is very useful insofaras it furthers the circulation of useful and tested books: but it can be more harmful if it is permitted to widen the influence of pernicious works." By the word 'pernicious', the pope meant any writing 'antagonistic to the Catholic faith.' Centuries have passed since the days of the pope Alexander VI. In many ways, liberalism reigned supreme in the past centuries. Accepting others' views has been accepted fact in our times, although not followed always in the strict sense of the term. But we are determined to follow it. The opinion of the 'other' shall be honoured, but at the same time the right to polemics will not be ignored.

It is the well considered opinion of the faculty members that the journal would be published in three parts–bodhi artham, bodhi vijanan and bodhi kala. The first one will deal with issues relating to finance and economics; the second one shall comprise discussion on science and technology and the third one will include articles on humanities and social sciences. But we are entirely opposed to the idea of rigid compartmentalization. A discourse on the history of science may be published in bodhi kala, or for example, a critique of colonial economy shall well accepted in bodhi artham. Our resources are limited, but our vision is an humble effort on our part to build up a knowledge based society.

That is why .....

Chief Advisor
bodhi

NOTES TO CONTRIBUTORS

Bodhi is an official journal of the Vivekananda College, Kolkata. Each volume of this journal includes three issues viz. *bodhi artham, bodhi kala* and *bodhi bijnan*; one issue per year. We accept any original article or review not published elsewhere. But, under any condition, the Editorial Board of Vivekananda College will not shoulder the responsibility of the views or criticisms expressed by the authors or reviewers.

The articles should be written with clarity and simplicity so that an undergraduate student from any branch of studies can understand and enjoy it. But in no way should fidelity of facts and concepts be compromised. Preference would be on new findings and/or new conceptual developments that might have important scientific, social or policy implications. Articles of interdisciplinary nature or transcending into a philosophical height will be a welcome.

General Guidelines

The manuscript should be typed either in English or in Bengali in 12pt Times of MS word, both one soft copy and one hard copy have to be submitted. They will not be returned. The drawings or BW photographs are to be digitised as '.tif' files or a neat copy has to be sent along with the text.

Articles must be not more than 8000 words including notes, tables and references.

Authors are requested to prepare their soft copies in text format. PDF versions cannot be processed by Bodhi. Authors are encouraged to use UK English spelling.

Authors are requested to provide full details for correspondence: Designation, postal and email address and phone number.

Letter

Readers of Bodhi are encouraged to send comments and suggestions (300-400 words) on published articles. All letters should have the writer's full name, designation and postal and email address.

Reference

The reference used in an article should be placed in appropriate position within brackets by author(s) name(s) followed by the year of publication (e.g. Ricklefs and Miller, 2006).

For Books

Khan, M.Y. and Jain, P.K. 2005. *Financial Management*. 1st Edn. Tata McGraw Hill, New Delhi.

For Journals

Hornell, J. 1912. New cestodes from Indian fishes. *Rec. Indian Mus.* 7: 197-209.

All the submissions will be peer reviewed by subject expert(s) of repute and decision by the Editorial Board on acceptance or refusal for publication will be final.

Author will receive two copies of the journal free of cost.

All manuscripts are to be sent to -

The Principal
Vivekananda College
269, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 063.
E-mail: vivekanandacollege63@gmail.com

CONTENTS

বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনা নিয়ে কিছু প্রশ্ন	দেবেশ রায়	৩
Spelling should be pensioned off, it terrorizes human beings from birth	Vivek Sahay	15
বধ্যভূমি উপত্যকা— রাষ্ট্রের সন্ত্রাস ও হারিয়ে যাওয়া মানুষ	সিদ্ধার্থ গুহ রায়	২৩
বাংলা ও বাঙালির বিলুপ্ত বাঘ— স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	স্বপন মুখোপাধ্যায়	২৭
Unveiling in the New Public Sphere: Narratives of Transgression by Muslim Women in the World of Blogs	Tajuddin Ahmed	31
The Logic of Ethics in the *Shadow* Industry: Literary Product and Literary Object in Three Peter Carey Stories	Arka Chattopadhyay	41
ইলেকট্রা মাই লাভ	সুরঞ্জন রায়	৫১
The Muchalinda-Buddha: its Origin and Evolution in the Art of Indian Asia	Shreyashi Chaudhuri	53
Caste and the Left: A Brief Sketch of the Caste Question and Three Decades of Left Front Rule in West Bengal	Surajit Gupta	63
(CoM) Promised Comparisons and the Trials of Truth-Telling	Anik Samanta	69
The Problem of Negation	Sangeeta Chattopadhyay	83
GandhIji-The journalist	Arnab Kumar Banerjee and Supriyo Hazra	91
From 'Hariyali' to 'Hool' Changing Profile of the Jungle Mahal Santals	Aparajita Bhattacharyya	99
Entering The Trap Of The Text	Manidip Chakraborty	109
চিকি আর নদী' এবং 'বাঁশি',— চিনুয়া আচিবির ছোটদের লেখায় ছোট-বড় সম্পর্কঃ একটি নারীনিসর্গনীতিবাদী পাঠ	মৌপিয়া মুখোপাধ্যায়	১১৩
হিন্দি চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের সামাজিক বিবর্তন	সুমনা সাহা দাস	১২১

We are here: **www.vckolkata63.org**

Published by: Tapan Kr. Poddar, Principal, Vivekananda College, from 269 D. H. Road, Kolkata-63
Printed by : Barnana, 6/7 Bijoygarh, Kolkata-32. Ph: 6451 3342